আরজিকর আদালত মিডিয়া সমাজ একটি ধারাবিবরনী

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা চটি সিরিজ

আরজিকর –
আদালত মিডিয়া সমাজ
– একটি ধারাবিবরণী

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

(বিনামূল্যে বিতরিত)

বাংলা চটি সিরিজের বই
আরজিকর -
আদালত মিডিয়া সমাজ
- একটি ধারাবিবরণী
প্রথম আন্তর্জাল সংস্করণ : আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশক: গুরুচণ্ডা৯ ট্রাস্টের পক্ষে সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
ফ্ল্যাট এ/২, ৭৩/১/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা - ৪২
যোগাযোগ: guruchandali@gmail.com; www.guruchandali.com

প্রচ্ছদ ও নামাঙ্কন: রমিত চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ সহায়তা: সায়ন কর ভৌমিক
মুদ্রণ সহযোগিতা ও অক্ষর বিন্যাস: যদুবাবু, সুনন্দ, দীপাঞ্জন ও অমিতাভ

সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

আরজিকর –
আদালত মিডিয়া সমাজ
– একটি ধারাবিবরণী

উৎসর্গ

যারা জানতে চায়

গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশিত অন্যান্য কিছু নন-ফিকশন

এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প - ডাঃ অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত
স্বাস্থ্য (অ)ব্যবস্থা - সম্পাদনা: পূণ্যব্রত গুণ
সবার জন্য স্বাস্থ্য: যে স্বপ্ন সত্যি করা যায় - পুণ্যব্রত গুণ সংকলিত
অতিমারী নিয়ে মারামারি- জয়ন্ত ভট্টাচার্য
করোনার দিনগুলি - ঐন্দ্রিল ভৌমিক
নাগরিকপঞ্জি ও ডিটেনশন ক্যাম্পঃ আসামে নাগরিক তৈরীর বৃত্তান্ত
দিল্লি হত্যাকাণ্ড, ২০২০ – সোমনাথ গুহ
পাঁচ মাথার মোড়- সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অনন্য মহীন (১)
অসুখ সারান - ঈপ্সিতা পালভৌমিক
বস্টনে বংগে - বর্ন ফ্রি
মোদীনমিক্স - মৈত্রীশ ঘটক এবং উদয়ন মুখার্জি; অনুবাদ - সৌম্য শাহীন
কাশ্মীর, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতন্ত্র ও জনমত - মিঠুন ভৌমিক
বন্দরের সান্ধ্যভাষা – সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি -সম্পাদনা- তুষার ভট্টাচার্য
অবান্তর পাঠশালা -অনুবাদ- জয়া মিত্র
বাংলা স্ল্যাং, সমুচয় ঠিকুজিকুষ্ঠি - অজিত রায়
আদালত-মিডিয়া-সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি - দেবাশিস সেনগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরী, পরমেশ গোস্বামী
ফেসবুকঃ মুখ ও মুখোশ – পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা, অর্ক দেব
অনুদানের লজ্জা – স্বাতী ভট্টাচার্য
হনন-কাল (পরিবেশ ও অতিমারি) – প্রতিভা সরকার
লক্ষ্মীর পাঁচা৯ - সম্পাদনাঃ যশোধরা রায়চৌধুরী
তাহাদের কথা - সংকলন

এছাড়া,
গুরুচণ্ডা৯র অন্য সব বইয়ের একত্রে সাজানো সমস্ত তথ্য -
কোথায় পাওয়া যাবে, দাম কত - সব,
নীচের QR কোডটা স্ক্যান করে সাইটে গেলেই পাওয়া যাবে:
https://www.guruchandali.com/book.php

সূচিপত্র

কেন এই বই? i

১। আরজি কর ধর্ষণ এবং খুন - বদলে গেল বাংলার ইতিহাস . . ১

২। ১৪ ই আগস্টের রাতদখল ৪

৩। বিচার দেবে সিবিআই ৭

৪। ময়নাতদন্ত ৯

৫। সুপ্রিম কোর্ট ১১

৬। পরের শুনানি ১৫

৭। তুঙ্গমুহূর্ত ১৯

৮। জয়ের পরের যুদ্ধ ২৫

৯। সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল ২৮

১০। গণমাধ্যমই যখন নেতা ৩২

১১। অন্তিম জয় ৩৪

১২। চার্জশিট ৩৭

১৩। খেলা ভাঙার খেলা ৪০

১৪। বিচার ৪৫

১৫। অন্যান্য বিষয়গুলি ৫০

১৬। শিক্ষা, ফলাফল, ইত্যাদি ৫৩

পরিশিষ্ট ৫৫

কেন এই বই?

আরজিকর কাণ্ড আমাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঝড়ের গতিতে হয়ে গেল। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে অনেক কিছু নজরে পড়েনা, অনেক কিছু মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। এই লেখা পড়লেই দেখবেন, কিছু জিনিস আপনি জানতেন না। কিছু জিনিস জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছেন। আজ থেকে কয়েক বছর পরে সমস্ত খুঁটিনাটিই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। সেটা যাতে না যায়, তাই এই প্রয়াস। প্রতিদিন ঘটনাপ্রবাহের খুঁটিনাটির নোট রাখা হচ্ছিল, তার ভিত্তিতেই এই লেখা। তাতেও কিছু বাদ যায়নি তা নয়। তার কিছুটা ইচ্ছাকৃত, গুরুত্বের বিবেচনায়, আরও কিছু বাদ গেলে অনিচ্ছাকৃত। যেহেতু নোটের ভিত্তিতে লেখা, দু-একটা তারিখও এক-আধদিন এদিকে-ওদিকে হয়ে যাওয়া অসম্ভব না। এইটুকু বাদ দিলে এই প্রতিবেদন শত শতাংশ তথ্যানুগ। আজ হোক, বা আগামী কাল, আপনি গবেষক হন বা সমাজকর্মী, এই নোটগুলি আপনার কাজে লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেইজন্যই বইটি প্রকাশ করা হল।

কারো একার পক্ষে এই প্রতিবেদন লেখা সম্ভব হত না। আস্ত একটা টিম কাজ করেছে পুরো কাজটায়। সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিজিৎ দাস, ঈপ্সিতা পালভৌমিক, দিব্যজ্যোতি মৈত্র, এই আমাদের লেখালিখির দল। বাইরে যে সাংবাদিকরা সাহায্য করেছেন, যাঁরা দ্রুতগতিতে নথিগুলো হাতের কাছে এনে দিয়েছেন, সহজবোধ্য কারণেই তাঁদের নাম দেওয়া গেল না।

— *লেখক*

“প্রত্যেক কাহিনির তিনটে দিক আছে।
একটা হল,
তাঁদের দিক, তাঁরা কী বলছেন।
একটা হল,
তোমার দিক, তুমি কী বলছো।
আর তৃতীয় দিকটা হল
আসল কথাটা কী,
সত্যি সত্যি কী হয়েছিল।
বলাবাহুল্য,
এই তৃতীয় দিকের প্রক্রিয়ার ব্যাপারটা
তুমিও পছন্দ করো না
তাঁরাও পছন্দ করেন না।”

তারাপদ রায়ের কবিতা, “কৌতূহল”।

১। আরজি কর ধর্ষণ এবং খুন – বদলে গেল বাংলার ইতিহাস

---

৯ আগস্ট, ২০২৪। বাংলার ইতিহাস প্রায় বদলে দিয়েছে যে দিনটি। ওইদিন ভোররাতে কলকাতা শহরের বুকে জনাকীর্ণ আরজিকর মেডিকাল কলেজের সেমিনার রুমে ধর্ষিতা এবং খুন হয়ে গেলেন এক ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসক, যাকে গোটা বাংলা, আস্ত ভারতবর্ষ এরপর থেকে চিনবে তিলোত্তমা নামে। দু-একদিনের মধ্যেই জানা যাবে, মূল অভিযুক্ত একজন সিভিক পুলিশ। সরকারি হাসপাতাল, কর্মরতা ডাক্তার, ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত সরকারি বাহিনীর একজন, সরকারের মুখ পোড়ানোর এর চেয়ে বেশি বড় উদাহরণ পাওয়া মুশকিল। ফলে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল বিক্ষোভ। জুনিয়ার ডাক্তাররা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিরোধী নেতানেত্রীরা দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। টিভিতে সরাসরি দেখানো হচ্ছিল চলমান বিক্ষোভের ছবি। হাসপাতাল থেকে গাড়িতে করে বার করা হচ্ছে নিহত ডাক্তারের মৃতদেহ, আর গাড়ির সামনে বুক-চিতিয়ে এক বিরোধী নেত্রী আটকানোর চেষ্টা করছেন সেই লাশবাহী গাড়িকে, এই চিত্র প্রতীকী হয়ে ঢুকে যাচ্ছিল মধ্যবিত্ত মননে।

সরকারের প্রতি ক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছিল। ক্রমশ জানা গেল, আরও ভয়ঙ্কর সব তথ্য। নিহত মেয়েটির পেলভিকের হাড় ভাঙা ছিল। দুটো পা ছড়ানো ছিল নব্বই ডিগ্রি কোণে। প্রচন্ড বলপ্রয়োগ না করলে সেটা সম্ভব না। চিকিৎসক দল গেলেন মৃতার বাড়িতে। ফিরে এসে, আগস্টের ১২ তারিখে সুবর্ণ গোস্বামী নামক একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক বললেন, তিনি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেছেন। খুব পরিষ্কার করে জানালেনঃ "পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা লিখেছে, তাতে একটা হিউজ পরিমান, প্রায় দেড়শো গ্রামের বেশি লিকুইড স্যাম্পল তারা পেয়েছে, সেটা হয়তো কিছুটা রক্তমাখা সিমেন হতে পারে, কিন্তু এতটা ভারি স্যাম্পল, আমাদের যা মনে হয়, এটা একজনের বীর্য হতে পারেনা।"

এর পরের দিন, অর্থাৎ ১৩ তারিখ, হাইকোর্টে একটি শুনানি হয়। মৃতার বাবা-মার হয়ে সেখানে সওয়াল করছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেখানে তিনি খুব স্পষ্ট

করে বলেন, কাল (অর্থাৎ ১২ তারিখ) যখন উনি ওই জায়গায় (আরজি করেই হবে) সহমর্মিতা জানাতে গিয়েছিলেন, তখন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তিনি ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেখে বলেছেন, এই ধরণের আঘাত একজনের পক্ষে করা সম্ভব না। অনেক লোকের অনেক কাজকর্ম থাকতেই হবে।

রাজ্য সরকারের উকিল এই শুনে আপত্তি করেন। কিন্তু বিচারক বলেন, ওরা বলছে প্রাইমাফেসি সাক্ষ্য অনুযায়ী এই জিনিসটা একজনের কাজ হতেই পারেনা। সরকারী উকিল তাতেও আপত্তি করেন। বিকাশ উত্তরে জোর দিয়ে বলেন, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় কাজ করা বিশেষজ্ঞ, এই কথা বলেছেন। দরকার হলে নামও দিতে পারেন। বিচারক বলেন, দরকার নেই। বিকাশ আবারও জোর দিয়ে বলেন, একাধিক জন জড়িতই। বিশেষজ্ঞের নামটা আর বলেননি, প্রাইমাফেসি সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে ব্যাপারটা উপস্থাপিত হয়, বিশেষজ্ঞের নাম-ধাম ছাড়াই।

ফলে বোঝা যাচ্ছিল, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। বহু লোক মিলে ঘটিয়েছে নৃশংস গণধর্ষণ এবং খুন। কিন্তু কারা এরা? আরও সব ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে আসতে শুরু করল, সামাজিক এবং গণমাধ্যমে। মৃত্যুটিকে প্রথমে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল আত্মহত্যা হিসেবে। মৃতার বাবা-মার কাছে তিনটি ফোন যায় হাসপাতাল থেকে, তার একটিতে সেরকমই বলা হয়েছিল। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর, তাঁদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়, একমাত্র মেয়ের দেহ দেখার আগে। রাতের অন্ধকারে তড়িঘড়ি করে করা হয় ময়নাতদন্ত। তারপর বাবা-মার সম্মতি না নিয়েই তড়িঘড়ি দাহ করে দেওয়া হয়। পুরোটাই সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যেই সেদিন সকাল থেকে আরজি করে জমায়েত হয়েছিলেন শাসক-ঘনিষ্ঠ একদল ডাক্তার। এক বিরাট চক্রান্ত, খুন, ধামাচাপার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল সমস্ত মাধ্যমে।

এরই মধ্যে ১৩ তারিখ ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। যে সেমিনার রুমে খুন হয়েছিল, ঠিক তার পাশের ঘরের টয়লেট এবং দেওয়াল ভাঙা শুরু হল। নানা মাধ্যমে শোনা গেল, ওখানে লুকিয়ে ছিল নানারকম সাক্ষ্য। খুনের পর হাতও ধোওয়া হয়েছিল ওই টয়লেটেই। কর্তৃপক্ষের মদতেই সেসব প্রমাণ লোপাট করে দেবার চক্রান্ত হচ্ছিল। কিন্তু কেন এত চক্রান্ত? কী ঢাকতে? কারা-কারা জড়িত। উত্তর পাওয়া গেল হঠাৎই হোয়াটস্যাপে অতিভাইরাল হয়ে যাওয়া এক অডিও-ক্লিপে। "আমি সোমা বলছি" দিয়ে শুরু হওয়া সেই ক্লিপে আরজিকরের একদম ভিতরের খবর দিয়ে এক মহিলা জানালেন, ঠিক কী হয়েছিল সেই রাতে। জানা গেল আরজি করের প্রধান সন্দীপ ঘোষ সেখানে একটা সেক্স এবং ড্রাগ র‍্যাকেট চালাতেন। সেই টাকা যেত পার্টিফান্ডে। সেখানে ইন্টার্ন-হাউসস্টাফদের একটা চক্র কাজ করত।

তিলোত্তমা এর বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাকে ছমাস ধরে হুমকি দেওয়া হত। হেড থেকে শুরু করে সেটা সবাই জানত। তাতেও আটকাতে না পারায়, ওকে একা ওই ঘরে রেখে আসা হয়। চক্রান্তে জড়িত আরও কজন জুনিয়ার ডাক্তার এবং তাদের মধ্যে একজন মেয়ে। তারপর মদ-টদ খেয়ে সাত-আটজন মিলে চড়াও হয়। দুজন হাত ধরে রাখে, তার মধ্যে একজন সেই মেয়েটি। তারপর জরাসন্ধের মতো পা টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো করা হয়। উল্টো করে শুইয়ে পিঠের উপরে বুট পরে হেঁটে যাওয়া হয়। মাথা দেওয়া হয় থেঁতলে। খুন করা হয় শ্বাসরোধ করে। এবং এতেই শেষ নয়, এরপর ঘটে নৃশংসতম ঘটনাটি। সঞ্জয় নামক এক সিভিক-পুলিশকে, যাকে নাকি তারকাটা-সঞ্জয় বলা হত, তাকে বলা হয়েছে, যা, বাকি কাজ করে আয়, এবং সে এসে সেই মৃতদেহকে ধর্ষণ করেছে। তারপর সবাই হাত ধোয় পাশের ঘরে, সেটা তো ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এর পরে আর বৃহত্তর চক্রান্ত নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকেনা। বস্তুত কোন-কোন জুনিয়ার-ডাক্তার এর সঙ্গে জড়িত তার একটা তালিকাও বেরিয়ে যায় সমাজমাধ্যমে। কৌতুহলোদ্দীপকভাবে তার প্রায় সবাইই মুসলমান, একজনকে বলা হয় তৃণমূল নেতার ছেলে, যেটা ভুল তথ্য। যাইহোক, এইসব ছোটোখাটো ভুল হয়েই থাকে। গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যম প্রায় ফেটে পড়ে চক্রান্তের প্রতিবাদে। এই সঞ্জয়কে যদিও পুলিশ অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার করেছিল ঘটনার পরদিনই, কিন্তু বোঝা যায়, পুরোটাই ধামাচাপা দেবার প্রক্রিয়ার অংশ। এর মধ্যে আন্দোলনের চাপে পড়ে আরজি করের প্রধান সন্দীপ ঘোষ পদত্যাগ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সরিয়ে না দিয়ে তাঁকে অন্য একটি মেডিকাল কলেজের প্রধান করে দেন। ফলে ধামাচাপা এবং তাতে সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসনের অংশগ্রহণ একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। পুলিশ এবং প্রশাসন বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় হারিয়ে বসে। হাইকোর্টে একটি মামলা হয় এর মধ্যে। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সিবিআইকে তদন্তভার দেবার জন্য আবেদন করেন। ১৩ তারিখ, রাতদখলের ঠিক আগের দিনের এক শুনানিতে তিলোত্তমার বাবা-মার হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, এক ফরেনসিক এক্সপার্টের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখে বলেছেন, এই ধরণের আঘাত একজনের পক্ষে করা সম্ভব না। অনেক লোকের অনেক কাজকর্ম থাকতেই হবে। সরকারি আইনজীবী সিবিআই তদন্তের দাবীতে আপত্তি জানাননি, এবং খুব দ্রুতগতিতে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়।

২। ১৪ ই আগস্টের রাতদখল

সরকারের বিরুদ্ধে গোটা জনসমাজ তখন ফুটছে। এর কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল এপারেও তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। শুধু প্রয়োজন একটি স্ফুলিঙ্গের। এই পরিস্থিতিতে ১৪ই আগস্টে আসে রাতদখলের ডাক। অনেকেই মনে করেছিলেন, সেরকম একটি স্ফুলিঙ্গ তৈরি হতে চলেছে। আরজিকরের ঘটনাটা এমনিতেই ভয়াবহ, প্রতিবাদের অন্য কোনো কারণ রাখেনা। তার উপর সমাজমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে নৃশংসতার বিবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলের মতো, বস্তুত গণমাধ্যমই পুরো উদ্যোগটার নেতৃত্ব দিয়েছিল বলা যায়। একই সঙ্গে সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলিও পতাকা ছেড়ে এসে পথে নামার উদ্যোগ নিয়েছিল। এবং তার উপরে ছিল তৃণমূলের নানা ক্ষেত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ। এই তিনটে জুড়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যে, প্রতিবাদে পথে না নামাকেই অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল। এমনকি এটা যে একটা ঘটনা, খুবই ভয়াবহ, কিন্তু গোটা রাজ্যের পরিস্থিতিই এরকম নয়, বাঙালির আইকন সৌরভ গাঙ্গুলি ১১ তারিখে এরকম একটা কথা বলে প্রায় গণশত্রুতে পরিণত হন। উল্টোদিকে এক অভিনেত্রী এর কয়েকদিনের মধ্যেই বলেন, তিনি এই রাজ্যে সন্তানের জন্ম দিতে চান না, একজন অভিনেতা-তথা-কৌতুকাভিনেতা বলেন, কার্যত দিল্লির চেয়েও খারাপ অবস্থা কলকাতার, সেসব অভিনন্দিত হয় প্রবল করতালিতে। জনতা সমাজমাধ্যমে খোঁজাখুঁজি শুরু করে, কোন শিল্পী, কোন খ্যাতনামা, দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, রাজ্যের অবস্থা ভয়াবহ বলে বিবৃতি দেননি। স্লোগান চালু হয়ে যায়, “যে এখনও দর্শক, সেই আসলে ধর্ষক”। পুরোনো একটা শব্দবন্ধ হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ে, “চটিচাটা”। যেকোনো ন্যূনতম ভিন্নস্বরকেই ”চটিচাটা” আখ্যা দেওয়া হয়। মোটকথা, ভদ্র মধ্যবিত্তের পক্ষে, গণ এবং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পুরো ন্যারেটিভটিতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। করলে হয় নিন্দিত হতে হবে কিংবা পিছিয়ে পড়তে হবে।

এইরকম একটা বিপুল সর্বসম্মতিই বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটায়। যেটা দেখা গেল ১৪ তারিখ রাতে। কলকাতা শহরের নানা বিন্দুতে, নানা শহরতলিতে সন্ধ্যা থেকে

ভোররাত পর্যন্ত দেখা গেল জনসমুদ্র। সংগঠিত কোনো দলের কোনো একটা জনসভায় এরকম ভিড় হয়েই থাকে। কিন্তু গোটা বাংলার নানা জায়গায় একই সঙ্গে একই রকম উদ্দীপনা, একই রকম ভিড় এবং একই রকম স্লোগান "উই ওয়ান্ট জাস্টিস", এ জিনিস বহুযুগ বাংলার ইতিহাসে দেখা যায়নি। এই স্লোগানটা খুব সম্ভবত কোনো সংগঠিত শক্তিরই পরিকল্পিত, নইলে সমসত্ত্বভাবে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব, কিন্তু কেউ কোনো কৃতিত্ব দাবি করেননি।

এখান থেকেই একটা ভয়াবহ সংঘর্ষের আবহে চলে যেতে পারত রাজ্য। কিন্তু অকল্পনীয় যেটা, তা হল, পুরো আন্দোলনটাই ছিল অভূতপূর্বরকম শান্তিপূর্ণ। কিছু কিছু জায়গায় জঙ্গি মনোভাব একদম ছিল না তা নয়, কিন্তু সে যৎসামান্য। পুলিশ এবং রাষ্ট্রশক্তিও ছিল অভূতপূর্বরকম সংযত। কোন জাদুমন্ত্রবলে এই সংযম উভয়পক্ষই অর্জন করেছিল বলা কঠিন, কিন্তু স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের যে প্যাটার্ন, সেটা প্রথমবার ভাঙে ওই রাতেই। আগুন নয়, প্রতিবাদ কার্যত পরিণত হয় রাতের কার্নিভ্যালে। বিশ্বের কোনো জায়গায় এরকম জিনিস ঘটেছে কিনা বলা কঠিন। এর কৃতিত্ব, কোনো সন্দেহ নেই, বাংলার জনতা এবং প্রশাসন উভয়েরই প্রাপ্য। একটা ভয়াবহতম ঘটনার তীব্রতম প্রতিবাদেও তাঁরা সভ্যতা এবং সংযম হারাননি। অভূতপূর্বভাবে বাংলার তিন প্রধান ফুটবল ক্লাবের সদস্য সমর্থকরাও রাস্তায় নামেন ।

কিন্তু তার মধ্যেই ঘটে গেল একটা বিচ্ছিরি ঘটনা। এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনার মতোই। খোদ আরজিকরে পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়ল একদল দুর্বৃত্ত। শোনা যায়, তারা সেমিনার রুম খুঁজছিল। খুঁজে না পেয়ে অন্যত্র ভাঙচুর করে। পুলিশ ছিল বাকি জায়গার মতোই সংযত। ব্যারিকেড ভেঙে পড়ছে দেখেও তারা বলপ্রয়োগ করেননি। ঘটনার যে ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, ওখানে ডিওয়াইএফআই এর বিক্ষোভ চলছিল ব্যারিকেডের সামনে। প্রচুর ভিড়। ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে। কিন্তু তারপর ভাঙচুর কারা চালায়, সেটার কোনো ফুটেজ প্রকাশ্যে আসেনি।

গোটা মিডিয়া, বাংলার এবং সর্বভারতীয়, দুই-ই, নজর রাখছিল ঘটনার উপরে। ফলে দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ে, যে, দুষ্কৃতীরা হাসপাতালে ঢুকে অপরাধস্থল ভাঙচুর করে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে, বা করার চেষ্টা করেছে। ধিক্কারে ফেটে পড়ে গোটা ভারতবর্ষ। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল পরের দিন মিডিয়ার সামনে মেজাজ হারান। মিডিয়াকে এই ভুল খবরের জন্য দোষারোপ করেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়না। ধিক্কার দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মিডিয়া সাধারণভাবে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। বরখা দত্ত ঘটনা ঘটার প্রায়

সমসাময়িক একটা টুইট করেছিলেন, "The emergency room at #RGKarCollege where the rape and murder took place has been destroyed by a violent mob."। পরে আরেকটা টুইটে বলেন, নেহাৎই একটা কমা না দেবার জন্য তাঁকে দোষারোপ করা যায় না। মানে, বাক্যটা এইভাবে পড়তে হতঃ The emergency room at #RGKarCollege [where the rape and murder took place] has been destroyed by a violent mob ।

কলকাতা পুলিশের হাতেই এই ঘটনার তদন্তভার যায়। এবং সমবেত ধিক্কারের মধ্যেই আরজিকর আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছয়। রাজ্য সরকারের পতন তখন নেহাৎই সময়ের অপেক্ষা মনে হচ্ছিল। আরজিকরের প্রধান এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীর গ্রেপ্তারও। খোদ আরজিকরেই এই হিংসা তো দাবানল ছাড়া আর কিছুর ইঙ্গিতবাহী নয়।

৩। বিচার দেবে সিবিআই

এই পরিস্থিতিতেই সিবিআই তদন্তভার হাতে নেয়। হাসপাতালে যান তাঁদের ফরেনসিক দল। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে খবর, যে, সব প্রমাণ ততদিনে লোপাট হয়ে গেছে। ময়নাতদন্তে গাফিলতি করে, তড়িঘড়ি করে লাশ পুড়িয়ে দিয়ে, হত্যাকাণ্ডের সকালে মানুষের ভিড়ের সুযোগে, পাশের ঘরের টয়লেট ভেঙে দিয়ে, এবং ১৪ই আগস্ট রাতে হামলা করে। কলকাতা পুলিশ সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করে কয়েকদিন। ১৪ই আগস্টের ঘটনার ফুটেজ সংগ্রহ করে অপরাধীদের ধরে দেবার আবেদনও জানায় সমাজমাধ্যমে। কিন্তু খড়কুটো দিয়ে ওভাবে বাঁধ দেওয়া যায়না। এছাড়াও, সাংবাদিক সম্মেলনে তারা যে কিছু ভুল তথ্য দিচ্ছে সেটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। শাসক-ঘনিষ্ঠ এক চিকিৎসক, যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ বলে, উনি একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ।

এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর একটা ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সমাজমাধ্যমে। তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গিতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছেন, "হ্যাঁ, আমরা দশ লক্ষ টাকা তো দিতেই পারি (মৃতার) পরিবারকে"। ভিডিওটা যদিও অনেক লম্বা ছিল, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কী বলেছিলেন, তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। আইন অনুযায়ীও দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবারই কথা। কিন্তু ছড়ায় শুধু ওই অংশটাই, যেখানে "ঔদ্ধত্য" ফুটে বেরোচ্ছে বাচনভঙ্গিতে। কয়েকদিন পরেই মৃতার বাবাও অভিযোগ করেন, তাঁকে পুলিশ টাকা দিতে চেয়েছিল। সব মিলিয়ে দুয়ে-দুয়ে-চার করে ধিক্কার উচ্চতর গ্রামে পৌঁছয়, যে, ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে কিনে নেবার চেষ্টা হচ্ছে মৃতার বাবা-মাকে।

কলকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার নড়বড় করতে থাকে ১৪ই আগস্টের পর থেকে। সরকারের হাতে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নাকি আন্দোলনকারীদের হাতে, বোঝা যাচ্ছিলনা। জুনিয়ার ডাক্তাররা কর্মবিরতি চালাতে থাকেন। 'ছাত্রসমাজ' নামের একটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অরাজনৈতিক সংগঠন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় ২৭শে আগস্ট। ইতিউতি শোনা যেতে থাকে বাংলাদেশের মতোই 'দফা এক, দাবি এক' এর স্লোগান। সরকার এবং পুলিশের প্রতি অবিশ্বাস

সর্বত্র। গণমাধ্যমেও আগুন জ্বলছে। প্রতিদিনই পথে নামছে মানুষ, চলছে আন্দোলন, চলতি কথায় যাকে বলা হচ্ছে 'জাস্টিস'। গায়ক-চলচ্চিত্রাভিনেতাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে রীতিমতো। শাসকদলের প্রতি ন্যূনতম নরম-মনোভাব সম্পন্ন কাউকে পেলেই তাকেও গো-ব্যাক দেওয়া হচ্ছে। এক-আধজন অভিনেতা তখনও পথে নামেননি, বা নিন্দা করে বিবৃতি দেননি, তাঁদের ঘিরে সমালোচনার ঝড়। আদালতেও রাজ্যের প্রতিনিধিরা ধমক খাচ্ছেন ক্রমাগত। এমন এক আবহ তৈরি হয়েছে, যেখানে শাসক দলকে বস্তুত খুঁজে পাওয়াই যাচ্ছেনা।

এর মধ্যে আগস্টের ১৮ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট সুয়োমোটো কগনিজেন্স নিয়ে আরজি করের তদন্তের তদারকির দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিল। অর্থাৎ, আরজিকরের খুন এবং দুর্নীতি, দুইয়েরই তদন্ত সিবিআই করবে, কিন্তু তারা হাইকোর্টে নয়, রিপোর্ট করবে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেই জবাবদিহি দেবে রাজ্যও। আর তদন্ত তদারকি করবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন এক বেঞ্চ। তার শুনানি হবে এর চারদিন পর, আগস্টের ২২ তারিখ। পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। রাজপথের দখল নিয়েছে 'জাস্টিস'বাহিনী। পুলিশ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। গণমাধ্যমের দখল সরকার-বিরোধীদের। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আগেই। এবার বিচার এবং তদন্তের তদারকি কলকাতা থেকে সোজা তুলে নিয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিবাদ। সন্দীপ ঘোষের নাম এর একমাস আগেও বিশেষ কেউ জানত না, এখন তিনিই বাংলার ভদ্রসমাজে সবচেয়ে নিন্দিত ব্যক্তি। তাঁর মদতদাতা হিসেবে রাজ্য সরকারও। বস্তুত রাজ্য সরকারের আর কোনো অস্তিত্ব আছেই বলেই মনে হচ্ছিল না আগস্টের ১৮ তারিখ, রাত দখলের চারদিন পর।

৪। ময়নাতদন্ত

ঠিক এর পরের দিন ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। আগস্টের ১৯ তারিখ তিলোত্তমার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেল গণমাধ্যমে। এই সেই বিন্দু, যখন গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমের চালু ন্যারেটিভে প্রথমবারের জন্য দেখা গেল কিছু ফাঁক। এতদিন মূলত 'আমি সোমা বলছি' বা তার রকমফের ন্যারেটিভই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। অনেক লোক মিলে ধর্ষণ এবং খুন করেছে। মৃতার পেলভিক হাড় ভাঙা ছিল, ময়নাতদন্তে ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গেছে মৃতার শরীরে, এগুলি হল গণধর্ষণ এবং গণ অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রমাণ। এই মোটামুটি ছিল চালু ধারণাপ্রবাহ। একজন ডাক্তার, আগেই লেখা হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে বলেছিলেন, "প্রায় দেড়শো গ্রামের বেশি লিকুইড স্যাম্পল তারা পেয়েছে, সেটা হয়তো কিছুটা রক্তমাখা সিমেন হতে পারে, কিন্তু এতটা ভারী স্যাম্পল, আমাদের যা মনে হয়, এটা একজনের বীর্য হতে পারেনা।" লোকে তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ফাঁস হবার পর দেখা গেল, ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। পেলভিক হাড় আদপেই ভাঙা নয়। শরীরে আঘাতের চিহ্ন অবশ্যই আছে, অনেকগুলিই আছে, কিন্তু সেটা ঠিক চালু ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না। এছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, ১৫১ গ্রাম বীর্যও আদৌ পাওয়া যায়নি। গাঢ় তরল সহ নারী অঙ্গগুলি পাঠানো হয়েছিল ফরেনসিকে, সেটার পুরো ওজন ১৫১ গ্রাম।

এটার গুরুত্ব এই, যে, অনেকে মিলে দলবদ্ধভাবে ঘটনাটা ঘটিয়েছে, সেই কাহিনিরেখাটাই পড়ে গেল প্রশ্নচিহ্নের সামনে। ফলে গুরুতর চক্রান্ত এবং তাতে জড়িয়ে বহুজন, এটাও আর অব্যর্থ সত্য রইলনা। পরে অবশ্য অনেকে হিসেব কষে দেখিয়েছেন, যে, ন্যারেটিভটাকে প্রশ্ন আরও আগেই করা উচিত ছিল। পুং মানুষের যা বীর্যক্ষরণের ক্ষমতা, তাতে ওই পরিমান বীর্যোৎপাদনে তিরিশ থেকে পঞ্চাশজন লাগবে। এমনকি ষাঁড়ই লাগা উচিত গোটাপাঁচেক। কিন্তু গণউন্মাদনার তোড়ে সেই কথাটা কেউই বলে উঠতে পারেননি। তদুপরি বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন, তার উপরে জীবনবিজ্ঞান বই খুঁজে পাটিগণিত করার কথা কেই বা ভাববে।

এরও অবশ্য বাকি সমস্ত প্রশ্নচিহ্নগুলো থেকেই যায়। সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা ডাক্তারের ধর্ষণ এবং খুন তো মিথ্যে নয়। তার উপরে চুপিসাড়ে রাতের

অন্ধকারে ময়নাতদন্ত, দেয়াল ভেঙে ফেলা, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট, এবং রাতদখলের রাতের ভাঙচুর, সবকটাই তখনও ভীষণ বাস্তব। ফলে আন্দোলন তখনও তীব্রগতির। কিন্তু এতে যেটা হয়, সরকার এবং প্রশাসন কিছুটা নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। সুপ্রিম কোর্টের ২২ তারিখের শুনানিতেও জনৈক আইনজীবী ১৫১ গ্রামের প্রশ্নটা তুলে বিচারপতির কাছে ধমক খান। প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমাদের সামনে এখন নির্দিষ্টভাবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন রয়েছে। আমরা জানি যে ১৫১ বলতে কী বুঝতে হবে । আমরা মিডিয়াতে যা পড়েছি সেটা ব্যবহার করে আইনগত যুক্তি তৈরি করব না।"

এইটুকুই, যৎসামান্য এবং সাময়িক অক্সিজেন দেয় সরকারপক্ষকে। রাজপথেও আবার পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যাওয়া শুরু হয়। ২৭ শে আগস্টের নবান্ন অভিযানে তেমন লোক হয়নি। কিন্তু হিংসা হয় অল্পবিস্তর। একজন পুলিশ আহত হন, এবং সম্ভবত এক চোখে দৃষ্টিশক্তি হারান। পুলিশও, খুব মৃদু হলেও বলপ্রয়োগ করে। গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকজনকে। কিন্তু গণমাধ্যমে জনমত তখনও পুলিশ-বিরোধী। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁরা প্রায় তৎক্ষণাৎ জামিন পান। তাঁদের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবেনা বলেও নির্দেশ দেয় আদালত। জাতীয় পতাকা নিয়ে জলকামানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া ঋষিপ্রতিম এক শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধের ভিডিও প্রতীকী এবং ভাইরাল হয়ে যায়। গণমাধ্যমে আলাদা করে ডেকে, নায়কের সম্মান দিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জানা যায়, উনি সাধু নন, এমনকি বৃদ্ধও নন। তবে নায়ক তো বটেই।

ঠিক উল্টোদিকে ভিলেন হয়ে যান রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি এবং তাঁর সহকারীরা মিলিয়ে মোট ২১ জন আইনজীবীর নাম নথিভুক্ত ছিল সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে। রাজ্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে ধর্ষকদের বাঁচাতে, এইরকম আওয়াজ ওঠে। ট্রোলের শিকার হন তাঁরা। কপিল সিব্বল আদালতে বলেন, "এখন ... রাজ্যের পক্ষে যারা উপস্থিত হয় তাদের কাছে সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে - এটাই চলছে। কারণ আমরা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হই।"

ফলে পরিস্থিতি খুব বেশি বদলে যায় এমন না। কিন্তু এইটুকু বোঝা যায়, যে, পুলিশ-প্রশাসন তিন-দানেই কিস্তিমাত হতে চলছে না। আরজিকর মামলা আরও লম্বা হতে চলেছে, এবং ন্যারেটিভ আর একটা থাকবেনা, বহুরকম এবং অনেক সময় পরস্পরবিরোধী ন্যারেটিভের সাক্ষী হতে চলেছে বঙ্গসমাজ।

৫। সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্টে এই সময়ই পরপর কটি বিপুলভাবে প্রচারিত শুনানি হয়। প্রথমটা হয় ২২শে আগস্ট, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। পরেরটা সেপ্টেম্বরে। তার মধ্যে বহু কিছু ঘটে যায়, বহুধাবিস্তৃত ঘটনাপরম্পরা তৈরি হয়, যার শুরু ওই শুনানিতেই। দুটো মূল বিষয় নিয়ে শুনানি হয় সেদিন, যার একটা ছিল তদন্তে সিবিআইয়ের স্টেটাস রিপোর্ট। সেই নিয়ে চুলচেরা প্রশ্নোত্তর হয়, রাজ্য এবং সিবিআইয়ের আইনজীবী তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিষয়টা ছিল ডাক্তারদের নিরাপত্তা এবং কর্মবিরতি। জুনিয়ার ডাক্তাররা ঘটনার দিন থেকে কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের আইনজীবী বলেন, জুনিয়ার ডাক্তাররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এখান থেকে আন্দোলনের নতুন একটা সুতো তৈরি হয়, পরবর্তীতে বহুবার শোনা যাবে সেই শব্দবন্ধ, থ্রেট কালচার। বিচারপতি স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করেন, কাদের দ্বারা সন্ত্রস্ত ডাক্তাররা? আইনজীবী বলেন, গুন্ডা, প্রশাসনের অংশ, এদের দ্বারা সন্ত্রস্ত। বিচারপতি ডাক্তারদের কাজে ফিরতে বলেন। কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা, গ্যারান্টি দেন। এবং কোনো সমস্যা হলে আদালতকে জানাতে বলেন।

কর্মবিরতি অবশ্য ওঠে না। এটাই আন্দোলন এবং আলোচনার আরেকটা কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন সন্দীপ ঘোষ। যদিও অভিযোগটা দুর্নীতির, খুন-ধর্ষণের নয়। পরের দিন ডাক্তাররা লালবাজার অভিযান করেন, সারারাত্রিব্যাপী অবস্থানের শেষে তদানীন্তন কমিশনারকে একটি প্রতীকী শিরদাঁড়া ধরিয়ে দিয়ে আসেন। আর, সেপ্টেম্বরের চার তারিখ নাগাদ তিলোত্তমার বাবা সাংবাদিক সম্মেলন করে, মিডিয়ার কাছে এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তার বয়ান মোটামুটিভাবে এরকমঃ

১. মেয়েদের মুখ দেখতে তাঁদের ঘণ্টাতিনেক বসিয়ে রাখা হয়।
২. পোস্টমর্টেম করতে দেরি করা হয়। পাঁচটার মধ্যে করা উচিত ছিল কিন্তু হয় ছটার পরে।

৩. তাঁরা দেহ রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচুর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, দাহ করতে তাঁরা বাধ্য হন।
৪. যখন তাঁর মেয়ের দেহ তাঁর ঘরে শায়িত ছিল, তখন ডিসি নর্থ, ঘরের একটা গলিতে ঢুকে, টাকা দেবার চেষ্টা করেন।

খুবই বিস্ফোরক বয়ান। আলোড়নও ওঠে যথেষ্ট। কিন্তু এবার ন্যারেটিভ আর নিটোল থাকেনা। পাল্টা বয়ানও শোনা যায়। হাইকোর্টে সরকারি আইনজীবী বলেছিলেন, ফরেনসিক টিম কাজ করছিল সে সময়, তবু মৃতদেহ দেখানো হয় ১ঃ১০ এ। ৩ঃ১০ এ নয়। অর্থাৎ, বয়ানে ঘন্টা-দুইয়ের তফাত। দ্বিতীয় আরেকটি ভিডিও ফাঁস হয় মিডিয়ায়, যেখানে মৃতার বাবা বলছেন, পুলিশ কোনো চাপ দেয়নি। মৃতার বাবা অভিযোগ করেন, ওটি জোর করে বলানো। কিন্তু দেখা যায়, অনুরূপ বয়ান অন্য একটি টিভি চ্যানেলেও কয়েকদিন আগে দিয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী কাউন্সিলার, যাঁকে মৃতার বাবাই ফোন করে ডেকেছিলেন বলে শোনা যায়, তিনি সম্পূর্ণ উল্টো একটি বিবৃতি দেন একটি ইউটিউব চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে।

ঠিক এর পরের দিন মিডিয়ায় ফাঁস হয় আরেকটি বিস্ফোরক নথি। হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, হঠাৎ করে পাশের ঘরের দেয়াল এবং টয়লেট ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। এই নথি থেকে দেখা যায়, সেই দাবিটা আসলে জুনিয়ার ডাক্তার এবং নার্সদের। হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর রীতিমতো বৈঠক করে তাঁরা ওই ঘর পুনর্নির্মাণের দাবি জানান। কদিন পরে আরও একটি নথি ফাঁস হবে, যাতে দেখা যাবে, তাঁরা জায়গাটা পরিদর্শনও করেছিলেন, এবং সাক্ষরকারীদের মধ্যে কয়েকজন আন্দোলনে নেতৃত্বও দিচ্ছেন।

এই নথিটি বিস্ফোরক মূলত দুটি কারণে। এর আগে যে ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছিল, তাতে গণধর্ষণ, পাশের ঘরে হাত ধোওয়া এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটে টয়লেট ভেঙে ফেলা একদম সরলরেখায় গাঁথা ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এর একটা অংশ ভেঙে পড়ে। ডাক্তারদের দাবিমতোই দেয়াল ভাঙা হয়েছিল, এটা জানার পরে ভেঙে আরেকটা অংশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, পুরো ঘটনাপ্রবাহে এই প্রথম আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের দিকেও আঙুল উঠতে শুরু করে। এই দেয়াল-ভাঙার ব্যাপারটা তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন, কিন্তু কখনও খোলসা করে বলেননি যে ওটা তাঁদেরই দাবি। আন্দোলনে সুবিধে হচ্ছে বলে এরকম কাণ্ড কি তাঁরা আরও ঘটিয়েছেন? এই প্রশ্নটা উঠতে শুরু করে।

প্রশ্ন উঠতে থাকে কর্মবিরতি নিয়েও। জুনিয়ার ডাক্তাররা টানা কর্মবিরতি চালাচ্ছিলেন এবং বলা হচ্ছিল এতে পরিষেবা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হচ্ছে না। সরকারপক্ষ উল্টো দাবি করছিলেন। এই চাপান-উতোরের মধ্যে আরজিকরেই এক রোগীমৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায়। এর মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় সাতজন রোগীর মৃত্যুর খবর দিয়েছিল একটি কাগজ। এসএসকেএম এর একটি খবরও বেরোয়, সেখানে বলা হয়, কার্ডিওলজিতে মাত্র একজন ডাক্তার উপস্থিত। আর খোদ আরজি করে একটা ঘটনা ঘটে উপস্থিত দৃশ্যশ্রাব্য মিডিয়ার চোখের সামনে। হুগলিতে দুর্ঘটনায় আহত হন এক যুবক। তাঁকে আরজিকরে পাঠানো হলেও ভর্তি করা যায়নি। কোনো ডাক্তার ছিলেননা। ফলে বিনা চিকিৎসায় মারা যান যুবক। এই অভিযোগ জানিয়ে সরাসরি টিভিতে মৃতের মা বলেন, সুবিচার চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি দেন। সরকারপক্ষের লোকজন মৃতের বাড়িতেও চলে যান। ডাক্তার সংগঠন ঘটনাটা অস্বীকার করে বিবৃতি দেন। জবাবে ডাক্তার সংগঠনের নেতাকে ফোন করেন মৃতার মা, তিনি উত্তর দিতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়েন। আরজি করেই নিয়ে যাওয়া হল কেন প্রশ্ন করেন। সেই অডিওও ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়।

নানারকম খবর হয় সিবিআইকে নিয়েও। সিবিআই তদন্ত এবং তার রিপোর্ট নিয়ে একটি খবর 'ফাঁস' হয়। সেখানে বলা হয়, সিবিআই রিপোর্টে কেবলমাত্র একজন খুনি বা অপরাধীর কথাই বলা আছে। সঞ্জয় রায়। দ্বিতীয় কেউ নন। পরবর্তীতে দেখা যায়, খবরটা ঠিকই ছিল, কিন্তু তখন সেটা জানা যায়নি। এছাড়া সিবিআই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায় বিচারপ্রক্রিয়ায়। উচ্চ আদালতে তদন্তের তদারকি হলেও আসল বিচার চলছিল শিয়ালদা আদালতে। সেখানে সিবিআই চূড়ান্ত গাফিলতি দেখায়। আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে। উপস্থিত ছিলেন একজন জুনিয়ার অফিসার। সিবিআইয়ের তরফে তদন্তকারী অফিসার ছিলেননা। আইনজীবীও ছিলেননা। বিচারক জামিন দিয়ে দেবেন কি না জানতে চাইবার পরে আইনজীবী খুঁজতে বেরোনো হয়। আইনজীবী এসে পৌঁছন শুনানির সময়ের ১ ঘন্টা ১০ মিনিট পরে। বিচারপতি নিজে সক্রিয় না হলে জামিন পেয়ে যাবারই কথা।

এই ঘটনা প্রকাশের পর শুধু সিবিআই নয়, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের উপরও আরেকটি সন্দেহের ছায়া এসে পড়ে। তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, যদিও তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু সেই নিয়ে আন্দোলনের কোনো অভিমুখ নজরে পড়ে না। প্রশ্ন ওঠে কেন। কেবলমাত্র সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করানোই কি আন্দোলনের লক্ষ্য?

রোগীদের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই পরস্পরবিরোধী বহুমুখী ন্যারেটিভের মধ্যেই চলে আসে সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী শুনানির তারিখ এবং আরজি কর কাণ্ডের এক মাস পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়।

৬। পরের শুনানি

সুপ্রিম কোর্টে পরের শুনানি হয় সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ, ঘটনার ঠিক এক মাস পরে। শুনানিতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উঠে আসে। এক, সুপ্রিম কোর্ট সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়, যে, ডাক্তারদের পরের দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। অন্যথায়, রাজ্য সরকার আইনগত ব্যবস্থা নিলে আর কিছু বলার থাকবেনা। এবং দুই, সিবিআইয়ের আইনজীবী দাবি করেন, হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজের মাত্র ২৭ মিনিট তাঁরা হাতে পেয়েছেন। রাজ্যের আইনজীবী এর বিরোধিতা করেন। বলেন, পুরোটাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চারদিকে খবর রটে যায়, যে, সিসিটিভি ফুটেজ মুছে ফেলা হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করার এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কী হতে পারে?

এই নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে যায়। গণধর্ষণ তত্ত্বে যেটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছিল, সেটা পূরণ করতে কিছু নতুন তত্ত্ব উঠে আসে। এর মধ্যে সবচেয়ে রোমহর্ষক তত্ত্বটা দেন, আইএমএ র যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্য। দশ তারিখে সরাসরি টিভিতে তিনি বলেন "১৫০ গ্রাম বীর্য যেভাবে যোনিদ্বারে পাওয়া গেছে, এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সন্দীপ ঘোষের অত্যন্ত অনুগত, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে গভীর রহস্য রয়েছে। বীর্যর যে পরিমাণ এবং বীর্য যেভাবে বাইরে থেকে ইনজেক্ট করা হয়েছে, সেটার প্রকৃত তদন্ত দরকার, কারণ এখানে কাউকে লুকোনো হচ্ছে, কারো অপরাধকে লুকোনো হচ্ছে।" অর্থাৎ, মৃতার যোনিতে শুধু ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গেছে তাইই নয়, সেটা ইনজেক্ট করা হয়েছে। অস্যার্থ, কাউকে লুকোনোর জন্য।

ওই দিন, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ সম্ভবত এই কাণ্ডের সবচেয়ে ঘটনাবহুল দিন। ওই দিনই লাইভে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি সমস্যার জন্য বিজেপি এবং সিপিএমকে দায়ী করেন। আর সামনেই শারদীয় উৎসব, তাই জনতাকে বলেন 'উৎসবে ফিরুন'। এই আহ্বান নিয়েও প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়। বিচার হয়নি, এখনও সরকার কাঠগড়ায়, এর মধ্যে উৎসব? অনেকেই বানান বদলে উৎসবকে 'উৎশব' লিখতে শুরু করেন ওই দিন থেকেই। তৃণমূলের সাংসদ জহর সরকার লাইভ টিভিতে এসে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তাঁর মূল অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে। আরজিকর কাণ্ডে অভিযুক্ত (তখনও হননি) সন্দীপ

ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী প্রাইজ পোস্টিং দিলেন কেন। খবরের কাগজে বেরোয়, আরজিকরের ৫১ জন চিকিৎসককে 'অকর্মণ্য' করে দিয়েছেন নতুন প্রধান সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। এঁরা নানারকম অভিযোগে অভিযুক্ত। ওই একই দিন, সন্দীপ ঘোষকে হাজির করা হয় আদালতে (দুর্নীতির মামলায়)। সেখানে 'ফাঁসি চাই' 'ধর্ষক' ইত্যাদি স্লোগান দেন আইনজীবীরা। শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয় বলেও খবর বেরোয়। সন্দীপ ঘোষকে সিবিআই অবশ্য নিজের হেফাজতে চায়নি। তাঁকে পাঠানো হয় বিচারবিভাগীয় হেফাজতে। এজেন্সি বলে, দরকার পড়লে আবার হেফাজতে নেবে। অর্থাৎ, আর তারা এই মুহূর্তে জেরা করার প্রয়োজন বোধ করছেনা।

সব মিলিয়ে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতে আবার প্যাঁচে পড়ে সরকার। আন্দোলন আবার তীব্র গতি পায়। কার্যত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে দশ তারিখ থেকেই সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে শুরু হয় জুনিয়ার ডাক্তারদের লাগাতার অবস্থান। আন্দোলন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছয়। রাতারাতি স্বাস্থ্যভবনের সামনে তৈরি হয়ে যায় সহস্র মানুষের আশ্রয় নেবার মতো ছাউনি। বসে টয়লেট। রাজসূয় যজ্ঞের মতো এক বিরাট আয়োজন প্রায় বিশ্বকর্মার কর্মতৎপরতায় নির্মিত হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত জনতার সমর্থন এবং অর্থানুকূল্য উপচে পড়ে। কিছু কিছু কর্পোরেট সংস্থাও সাহায্য করেছিল বলে শোনা যায়। খাবার-দাবারেরও এলাহি আয়োজন হয় এবং বেঁচে যেতেও থাকে বলে ডাক্তাররাই সমাজমাধ্যমে পোস্ট দেন। উঠতে থাকে স্লোগান, রোজই হতে থাকে মিছিল, কলকাতা সংলগ্ন শহুরে মধ্যবিত্তের অবশ্য গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায় আন্দোলনস্থল।

ডাক্তারদের দাবি ঠিক কী, এই নিয়ে অবশ্য কিছু ধোঁয়াশা দেখা দেয়। বেশ কটা খসড়া বাজারে ঘুরতে থাকে। এর আগে খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল, তা এরকমঃ "প্রথমত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করা, অপরাধের উদ্দেশ্য সামনে আনা এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দ্বিতীয়ত, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচার। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে 'ব্যর্থ প্রমাণিত' কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলের ইস্তফা। চতুর্থত, রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। পঞ্চমত, রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়া এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা।" এখন এর সঙ্গে যোগ করা হয়, কয়েকজন পুলিশ ও সরকারি কর্তা এবং স্বাস্থ্যসচিবের পদত্যাগের দাবি।

মিডিয়ায় আসতে থাকে ভয়ানক সব প্রতিবেদন। বীর্য ইনজেক্ট করার কথা আগেই লেখা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় শান্তনু ঘোষ একটি প্রতিবেদন লেখেন পরের দিন, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ। তাতে ভয়াবহতর এক বর্ণনা দেওয়া হয়। সেখানে, তদন্তকারী সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়, মর্গে মৃতের সঙ্গে সহবাস এবং তার পর্নো ভিডিও তুলে বিক্রি করা, এইরকম একটি চক্র চালু ছিল আরজিকরে। "সাধারণত প্রতি দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত আটটার মধ্যে মর্গ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোল্ড-চেম্বার থেকে শুরু করে অন্যান্য আলমারি, ঘরের চাবি সব রাখা থাকে মর্গের মূল কার্যালয়ে। আর মূল দরজার চাবি রাখা থাকে হেড ডোমের কাছে। আর, রাতে আসা মৃতদেহ রাখার জন্য মর্গের পিছনের দরজার চাবি রাখা থাকে অন্য এক কর্মীর কাছে। অভিযোগ, শেষ কয়েক মাস ধরে অধিকাংশ দিন গভীর রাতেও মর্গের ভিতরের আলো জ্বলতে দেখা যেত। আরজিকরে ৪০টির বেশি কোল্ড চেম্বার রয়েছে। রাতে সেই চেম্বার খোলা হত বলেও অভিযোগ। তদন্তকারীদের সন্দেহ, সেই সময়েই বের করা হত মৃতদেহ। তার পরে চলত সহবাস, যা মোবাইলের ক্যামেরা বন্দি করা হত। কারা এই কাজে যুক্ত, সেই চক্রের শিকড় কত দূর বিস্তৃত, সেটাই এখন খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।"

আগেরটার মতো এটাও অলীকত্বের ধার ঘেঁষে যায়। কারণ, এর কয়েকদিন আগে প্রায় একই রকম কথা এসেছিল আনন্দবাজারের পাতায়। কিন্তু সেটা তেইশ বছর আগে, ২০০১ সালের ডাঃ সৌমিত্র বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে। লেখা হয়, এক চিকিৎসকের দাবি, "সেই সময়ে আমি আরজি করের ছাত্র। আমরা জানতাম সৌমিত্রের মৃত্যু শুধুই আত্মহত্যা নয়। হাসপাতালের ক্লাস ঘর, সেমিনার রুম বা হস্টেলে সেই সময়ে যৌনকর্মী নিয়ে আসা হত। যৌনকর্মীদের দিয়ে ভিডিয়ো শুট করানো হত। এর পর সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার বড় চক্র চলত। তৎকালীন হাসপাতালের কর্তারা সবই জানতেন। এমনও হত, যৌনকর্মী জোগাড় করতে না পারায়, ব্যবচ্ছেদের জন্য রাখা মৃতদেহের সঙ্গেই যৌনতা চলছে। সেই ভিডিয়োয় মৃত মানুষটির মুখের জায়গায় বসানো হত কোনও অভিনেত্রীর মুখ। এর পর ছড়িয়ে দেওয়া হত সেই ভিডিয়ো। কর্তৃপক্ষ সব জানতেন।"

এটায় অবশ্য সূত্র সিবিআই বা তদন্তকারী দল নয়। দুটো যোগ করে যা দেখা যায়, অন্তত বছর ২৩ ধরে আরজিকরে চলছে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গম এবং তার ভিডিও তুলে বিক্রির চক্র। এই ধরণের পর্নো সাধারণ পর্ন সাইটে পাওয়া যায়না। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বলেও জানা যায়না। হয়তো গোপনে ছড়ানো হয়। কিন্তু মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গম করার মতো মানুষ ২৩ বছর ধরে জোগাড় করে চলা, সাধারণবুদ্ধিতে অসম্ভবই মনে হয়।

কিন্তু এই সমস্ত ভয়াবহ বিবরণ পড়ে, কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব না। তাই বাড়তে থাকে মিছিলের দৈর্ঘ্য। জনসমর্থন। গণমাধ্যম এই সময় থেকেই কার্যত আন্দোলনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। সেগুলো নিয়ে পরে লেখা হবে। আপাতত, সেপ্টেম্বরের গোড়ায়, পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, যে, আন্দোলনের সামনে সরকারের পিঠ ঠেকে গেছে। মুখ্যসচিব চিঠি পাঠিয়ে আলোচনায় বসতে বলেন। ডাক্তাররা প্রত্যাখ্যান করেন। চিঠিচাপাটি চলতে থাকে।

৭। তুঙ্গমুহূর্ত

সেপ্টেম্বরের বারো থেকে উনিশ - এই সাতদিন হল এই আন্দোলনের সবচেয়ে নাটকীয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতময় সাতটি দিন। ধর্ণা এবং সরকার ও জুনিয়ার ডাক্তারদের চাপান-উতোর চলতে থাকে একই যোগে। ১৬ তারিখ, মঙ্গলবার নাগাদ নবান্নের তরফে মেল করে জুনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠকে ডাকা হয়। আন্দোলনকারীদের তরফে বলা হয়, মেলের বয়ান অপমানজনক। তাঁরা উত্তর দেবেন না। কিন্তু উত্তর দেন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাত ৩ঃ৪৫ এ আসা মেল নিয়ে কটাক্ষ করেন। শর্ত দিয়ে আলোচনা হয়নাও বলেন। যদিও, বুধবার নবান্ন আবার চিঠি দেয়। আন্দোলনকারীদের তরফে উত্তরও দেওয়া হয়। বলা হয়, তাঁদের চারটি শর্ত মানতে হবে, যাঁর মধ্যে অন্যতম হল, মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হবে। এর পর বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আবার মেল পাঠান আন্দোলনকারীদের। জানিয়ে দেন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীও। তবে বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার চেয়ে জুনিয়র ডাক্তারেরা যে শর্ত দিয়েছিলেন, তা মানা হবে না। বৈঠকে ১৫ জনকে আসতে বলা হয়। এরপর আন্দোলনকারীদের ৩০ বা ৩৫ জনের প্রতিনিধিদল নবান্নে উপস্থিত হয়। কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার না হলে আলোচনায় যোগ দেবেন না, বলা হয়। সরকারের তরফে ভিডিও রেকর্ড করার কথা বলা হয়, যা সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হবে। কিন্তু আলোচনায় রাজি হননি আন্দোলনকারীরা। ফলে আলোচনা হয় না।

মুখ্যমন্ত্রী এরপর লম্বা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনদিন ধরে অপেক্ষা করেছেন, এবং সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয় সরাসরি সম্প্রচার করা যায়না এও বলেন। এছাড়াও তিনি হাসপাতালে ডাক্তারের অভাবে রোগীমৃত্যুর কথাও বলেন। সংখ্যা উল্লেখ করে বলেন, ২৭ জন মারা গেছেন এই কর্মবিরতির ফলে। ডাক্তাররাও ফিরে আসেন স্বাস্থ্যভবনের সামনে। ধর্ণা চলতে থাকে, আলোচনা হয় না। ডাক্তারাও তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে একটি ভিডিও নিজেদের ফেসবুক পাতায় প্রকাশ করেন। তাতে পাঁচটি দাবীর কথা বলা হয়েছে। এই প্রথম সুস্পষ্টভাবে ডাক্তারদের দাবীগুলো তাঁদের পাতায় প্রকাশ করেন।

আন্দোলনের গতি অক্ষুণ্ণ থাকলেও, পরেরদিন ঘটনাবলী একটু অন্যদিকে মোড় নেয়। একাধিক জিনিস নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ একটি ভিডিও এবং একটি অডিও 'ফাঁস' করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, ধর্ণামঞ্চের কাছে স্থানীয় বিজেপি অফিসে ডাক্তারদের আন্দোলনের কয়েকজন উপস্থিত। এর আগে ডাক্তাররা রাজনৈতিক সংস্রবের কথা অস্বীকার করেছিলেন, ভিডিও সেটাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে। এর মধ্যে বিজেপির নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল উপস্থিত হয়েছিলেন ধর্ণামঞ্চে। জবাবে ডাক্তাররা তাঁকে গো-ব্যাক ধ্বনি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এরপর আন্দোলনকারীদের বেনজির ভাষায় আক্রমণ করেন। ক্যামেরার সামনে বলেন, "এই মালগুলো (যারা গো-ব্যাক বলেছে) মাল খায় গাঁজা খায় হেরোইন খায় চরস খায়, এদের সঙ্গে ডাক্তারির কোনো সম্পর্ক নেই।" এই প্রথম বিরোধীপক্ষের কোনো নেতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

কুনাল ঘোষ একটি অডিওও ফাঁস করেন। অডিওটি একটি টেলিফোন কথোপকথনের। তাতে শোনা যায়, দুই ব্যক্তির মধ্যে ডাক্তারদের জমায়েতে হামলার পরিকল্পনার কথা। আন্দোলনকারী কারো উপর হামলা হলে আন্দোলনকে বাড়িয়ে তোলা যাবে। 'ফাইট-টু-ফিনিশ' নামক একটি শব্দবন্ধও উচ্চারিত হতে শোনা যায় কথোকথনে। শোনা যায়, পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে, কিন্তু বিশদ জানা যায়না।

এর মধ্যে জানা যায়, জুনিয়ার ডাক্তাররা রাষ্ট্রপতিকে একটি মেল করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যাবার আগেই এই মেল করা হয়েছিল বলে ওঁরা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ছিল বিকেলে, কিন্তু ন্যায়বিচার চেয়ে মেল করা হয় সকালেই। উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে কপিতে রাখা হয়। অগ্নিমিত্রাকে গো-ব্যাক বলা সত্ত্বেও এই চিঠি কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং কেন্দ্রের প্রতি নমনীয় বলে কিছু গুঞ্জন শুরু হয়। কারণ, দেখা যায়, মেলে রাজ্য সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং কোর্টের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কিন্তু সিবিআই সম্পর্কে ডাক্তাররা নিশ্চুপ। এছাড়াও ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তার দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ-দফা দাবি সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। ফলে, দাবিটা ঠিক কী, এই নিয়ে আবারও অস্পষ্টতা দেখা যায়।

এসব চলতে চলতেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এ পর্যন্ত ২৯ জন মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়। প্রত্যেকের জন্য দু-লাখ টাকা সাহায্য ঘোষণা করেন। স্পষ্টতই, তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত এবং গরীবের মধ্যে বিভাজনটি উস্কে দিতে চান। কিন্তু সেটা পুরোটাই বানানো কথা নয়। গণমঞ্চ বলে একটি সংগঠনের বিবৃতি থেকে দেখা যায়,

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের সংখ্যা মোট ডাক্তারের প্রায় ৫০%। এর অর্থ হল জুনিয়ার ডাক্তার কর্মবিরতিতে যা ভাবা হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি বিপর্যয় হবার কথা।

এরই মধ্যে শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। ধর্ণা চলতে থাকে। বড় বড় তাঁবু এসে পৌঁছয় ধর্ণামঞ্চে। এখানেও কোনো কর্পোরেট গোষ্ঠীর অনুদান আছে বলে গুঞ্জন ওঠে।

পরেরদিনই নতুন নাটক শুরু হয়। সকাল শুরু হয় কলতান দিয়ে। আগেরদিন যে অডিও ক্লিপ 'ফাঁস' হয়েছিল, সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্তকে তার একটি কণ্ঠস্বর হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করে পঃবঃ পুলিশ। তারা একটা সাংবাদিক সম্মেলনও করে, অভিযোগটা যথাযথ বলে। অর্থাৎ, চক্রান্ত গভীর। আন্দোলনেরই কাউকে আহত বা নিহত করে সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে। এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে গ্রেপ্তার করা হয় গোটা আন্দোলনে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অডিও ক্লিপটিকে জাল, এবং পুরোটাকেই চক্রান্ত বলেন। মোসাদ, সিআইএ, এদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ, বলেও দাবি করেন। গ্রেপ্তার অবশ্য করেছিল রাজ্য পুলিশ।

দিনের বেলা আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎই হাজির হন ধর্ণামঞ্চে। বলেন, যদি ডাক্তাররা কাজে ফিরতে চান, তা হলে তিনি দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। সিবিআইকে অনুরোধ করেন দোষীকে ফাঁসি দেবার জন্য। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন না বলে নিশ্চিন্ত করেন। ডাক্তাররা জবাবে বলেন, তাঁরা পাঁচ দফা দাবি নিয়ে যে কোনো জায়গায় আলোচনায় বসতে চান। এবং কাজে ফিরতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর আসাকেও তাঁরা সদর্থক ভূমিকা হিসেবেই নিচ্ছেন।

এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে ছাত্ররা একটি চিঠি লেখেন। তাতেও এই সুরটিই ছিল। এবং আলোচনায় বসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সুবিধামতো উপযুক্ত সময় ও স্থান জানাতে অনুরোধ করা হয়। জবাবি মেলও আসে দ্রুত। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাড়িতে ১৫ জন ডাক্তারকে আসতে অনুরোধ করেন, সন্ধ্যা ৬ টায়। সেই মতো জনা ৪০ ডাক্তার বাসে চড়ে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রীর আবাসস্থলে। কিন্তু সেখানে লাইভ স্ট্রিমিং এবং রেকর্ডিং নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়। সরকারের তরফে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছিল আগেই, যে, স্ট্রিমিং হবেনা, রেকর্ডিং করে সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হবে। ডাক্তাররা প্রথমে স্ট্রিমিং এর দাবী করেন। তারপর নিজেদের ভিডিওগ্রাফারকে ঢুকতে দেবার দাবি করেন। ডাক্তাররা জানান, যে, রেকর্ডিংটা দরকার, অবিশ্বাসের জন্য না, তাঁদের নিজেদের সাথী আন্দোলনকারীদের কাছে স্বচ্ছতার জন্য। সাথীরা কেন নেতাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, ব্যাখ্যা করেননি।

কিন্তু কোনোটাই নতুন করে মেনে নেওয়া হয়নি।

এরপর নানা নাটকীয় কাণ্ড ঘটতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে আলোচনায় ঢুকতে অনুরোধ করেন। বলেন, যে, চিঠি-চাপাটিতে এই ব্যাপারটা আগেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং এরকম কোনো দাবিও চিঠিতে ডাক্তাররা করেননি। তিনি বলেন মিটিং মিনিটসে উভয় পক্ষের সই করে সেটা দেওয়া যেতে পারে। একান্তই আলোচনা না হলে চা খেয়ে যেতেও অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতে বরফ গলেনি। ডাক্তাররাও আরও একদফা আলোচনা করেন এবং সব মিলিয়ে প্রায় ঘন্টা আড়াই পরে জানান, যে, তাঁরা ওই শর্তেই আলোচনা করতে রাজি। তখন মুখ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁরা জানান, এত দেরিতে আর আলোচনা সম্ভব না। ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং অভিযোগ করেন, যে, তাঁদের কার্যত ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। যদিও সেই কথোপকথনের ভিডিওও এসেছে, যা দেখে, তেমন কিছু মনে হয়না।

নাটক চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছয়, যখন, ঠিক এই সময়ই খবর আসে, সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। সন্দীপ ঘোষ আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু সেটা দুর্নীতির অভিযোগে। এবারের গ্রেপ্তারি খুন এবং ধর্ষণের মামলায়, এবং খবরটা আসে, ঠিক এই সময়েই। নেটে জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে, মুখ্যমন্ত্রী এই সংক্রান্ত কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াতেই আসলে আলোচনা করেননি।

সরকার এর পরে ভয়াবহ অস্বস্তিতে পড়ে। সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পরদিন আদালতে সিবিআইয়ের বক্তব্য থেকে। সংবাদপত্রের রিপোর্টে পাওয়া যায় সাত দফা সন্দেহঃ

ক। ওসি ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছেছিলেন।

খ। দ্রুত ঘটনাস্থল ঘেরার কাজ করতে ব্যর্থ।

গ। এফআইআরএ দেরি।

ঘ। ভিডিওগ্রাফি ঠিকঠাক হয়নি।

ঙ। পরিবারের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের দাবি না শুনেই দাহ।

চ। মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে দেরি।

ছ। মৃত বুঝেও অভিযোগপত্রে 'অচৈতন্য' লেখা হয়েছে।

এগুলো ঠিক 'খুন-'এর অভিযোগ নয়, বরং গাফিলতি বা বড়জোর ধামাচাপা দেবার অভিযোগ। কিন্তু তাতেও সরকারের অস্বস্তি কমার কোনো কারণ থাকেনা। ডাক্তারদের শিবিরে দেখা যায় বিজয়ের আনন্দ। সল্টলেকে বিরাট মিছিল হয়

সেদিন। বহু মানুষ, বহু এনজিও এবং বহু কর্পোরেট সংস্থার উপস্থিতি দেখা যায়। কলকাতার এফএম রেডিওর এক সঞ্চালক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, দেখা যায়। ঠিক মুন্নাভাই-এমবিবিএস জাতীয় বলিউডি সিনেমায় যেমন থাকে। খাবার-দাবার-উপকরণে সমর্থনের ঢল নামে। মানুষেরও। উপকরণ এবং কর্পোরেট সাহায্য নিয়ে কিছু কটাক্ষ দেখা যায় সমাজমাধ্যমে, কিন্তু সেটা, অন্তত শহুরে-মধ্যবিত্ত সমর্থনের বিপুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই অংশের স্বরও ক্রমশ জঙ্গি হয়ে ওঠে। মমতাকে নিয়ে 'কালীঘাটের ময়না' ইত্যাদি স্লোগান উঠতে থাকে। সিব্বলকে নিয়ে স্লোগান হয় 'কপিল সিব্বল ছোটোলোক'। বিনীত গোয়েলের নাম করে 'চটি মারো তালে তালে' স্লোগান শোনা যায়। 'চটিচাটা' হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক লব্জ। আন্দোলনকারীরা সমাজমাধ্যমেও আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। কুনাল ঘোষ স্ক্রিনশট সহ অভিযোগ করেন, সমাজমাধ্যমে বক্তব্য বন্ধ করার জন্য ডাক্তাররা রীতিমতো গ্রুপ খুলে সংগঠিত উদ্যোগ নিচ্ছেন। এক অভিনেত্রী ক্যামেরার সামনে শাসকদলের নেতাদের গণপিটুনির হুমকি দেন, যেটা যেকোনো জমানাতেই অভাবনীয়। এর প্রতিটাই সীমানা-টপকানো। উল্টোদিকে, কুণাল ঘোষও সমাজমাধ্যমে তৃণমূলের যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যকে ট্যাগ করে ওই অভিনেত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। এর ব্যাপক সমালোচনাও হয়। শহুরে মধ্যবিত্ত আন্দোলনকারীদের মনোভঙ্গি তখন - সরকার কোণঠাসা, জয় অনিবার্য, কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সে আন্দাজ ভুল ছিলনা। পরদিনই মুখ্যমন্ত্রী আবার ডাকেন ডাক্তারদের। এবার সত্যিই মিটিং হয় কালীঘাটে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়, তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে কিছু কথা বলেন। দেখা যায়, ডাক্তারদের প্রায় সব দাবীই মেনে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের দাবি ছিল পাঁচদফা। সেটাও বেশ কয়েকবার বদলেছে। কী মানা হয়েছে, তার মোটামুটি তালিকা এরকমঃ

১. তিলোত্তমা হত্যার দ্রুত বিচার এবং শাস্তি । এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত না, দাবিতেই আছে।
২. সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশন। - মেনে নেওয়া হয়েছে।
৩. ডিএমই, ডিএসই, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ। - মেনে নেওয়া হয়েছে (স্বাস্থ্যসচিব ছাড়া)।
৪. পুলিশ কমিশনারের অপসারণ। - মেনে নেওয়া হয়েছে।

৫. ডিসি নর্থ এবং সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। - ডিসি নর্থ মেনে নেওয়া হয়েছে।
৬. নিরাপত্তার ব্যবস্থা। - এটা আগেই মেনে নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আগের শুনানিতে।
৭. থ্রেট কালচার বন্ধ করা। - এইটার কংক্রিট পয়েন্টগুলো লম্বা দৈর্ঘ্যের, নির্বাচন ইত্যাদি জড়িত। সম্ভবত এটা নিয়ে কথা হয়েছে, বোধহয় আরও হবার কথা।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে এগুলো ঘোষণা করেন। এরপর ডাক্তাররা অবস্থানে ফিরে এসে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য মোটের উপর এইঃ বিনীত গোয়েল অপসারণ হয়েছে। ডিএমই, ডিএসইকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ডিসি নর্থকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এসবই আন্দোলনের জয়। কথাটা মিথ্যে নয়। আন্দোলনের জয় হয়েছে, ওই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সে কথা বলাই উচিত।

৮। জয়ের পরের যুদ্ধ

আন্দোলন জিতেছে, এইখানেই শেষ হলে, এই ধারাবিবরণী এখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, ডাক্তাররা এটা একটা ছোটো জয় হিসেবে দেখছেন। আসল যুদ্ধটা বাকিই আছে। সম্ভবত তাঁদের লক্ষ্যবস্তু অনেক উঁচুতারে বাঁধা ছিল, বা তাঁরা সিংহের পিঠে উঠে পড়েছিলেন, বা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। যে কারণেই হোক, ঘটনাপরম্পরা গড়াতে থাকে এর পরেও। এই ধারাবিবরণীর তৃতীয় অধ্যায়ের দিকে।

এবারের ঘটনাপরম্পরাকে বলা যেতে পারে দীর্ঘায়িত বিচারপর্ব, যা শুরু হয়, ঠিক পরের দিন, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানি দিয়ে। ডাক্তারদের হয়ে সওয়াল করেন বিখ্যাত আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং এবং করুণা নন্দী। রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বল তো ছিলেনই। সিবিআইয়ের আইনজীবী আবারও দাবি করেন, যে, তাঁরা মাত্র ২৭ মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছেন। সিব্বল অস্বীকার করেন। এই নিয়ে তরজা হয়। পুরোটা যাচাই করে দেখতে বলেন। বিচারপতিও সায় দেন। বোঝা যায়, সিবিআই তখনও পুরো ফুটেজ যাচাই করে দেখেইনি।

একটা বিরাট সময় ব্যয় করা হয় ডাক্তারদের নিরাপত্তা বিষয়ে। বিচারপতি রাজ্যকে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। দ্রুত কাজ করতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, দাবি মেনে নেওয়ার কথা আসে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে কর্মবিরতির জন্য, এই প্রসঙ্গও ওঠে। কিন্তু জয়সিং বলেন, ভয়াবহ ব্যক্তিরা এখনও আছে, এখনও হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং ডাক্তারদের মধ্যে ভয় কাজ করছে। এই যুক্তিটা বিচারপতি মেনে নেননি। পুনরায় ডাক্তারদের কাজে ফেরার নির্দেশ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এই আশ্বাস দেওয়া হয়। জয়সিং, 'ভয়'-এর ব্যাপারটা উল্লেখ করা সত্ত্বেও, বস্তুত সম্মতি দেন। কারণ, যে আন্দোলনে জয়লাভ হয়ে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে, তদন্ত এবং নিরাপত্তার প্রসঙ্গ যখন স্বয়ং সুপ্রিম কোর্ট তদারক করছে, তখন আন্দোলন কেন চলবে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া সত্যিই যাচ্ছিলনা।

এই অবস্থায় জুনিয়র ডাক্তাররা সাধারণ সভা করে অবস্থান তুলে নেবার কথা ঘোষণা করেন সেই রাতে। তাঁরা সল্টলেক থেকে হাসপাতালে ফেরেন, কিন্তু কর্মবিরতি ওঠেনা। মুখ্যসচিবের সঙ্গে চিঠিচাপাটি চলতে থাকে। সাদা চোখে

আন্দোলন চলার আর কোনো কারণ দেখতে পাওয়া যায়না, কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করা বাকি, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু লক্ষ্যটা কী, একেবারেই স্পষ্ট ছিলনা।

পরের দিন, আরও দুটো মোড় ঘোরানো ঘটনা ঘটে। অডিও ক্লিপ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত। তাঁকে জামিন দেওয়া হয়নি, এবং এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। আইনজীবী ছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। শুনানিতে দু-পক্ষের কথা শুনে আদালত কার্যত কেস থেকে মুক্তি দেয় কলতানকে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কারণ কলতানের আইনজীবী অডিও-ক্লিপটা যে মিথ্যে, এরকম কোনো দাবীই করেননি। তারপরেও নেহাৎই লঘু অপরাধ বিবেচনা করে আদালত তাঁকে জামিন দেয়, তাতে অদ্ভুত কিছু নেই। আদালত এও বলে, যে, অন্য কোনো অজুহাতে এই কারণে কলতানকে আবার ধরা যাবেনা, সেটাও সমস্যাজনক নয়। অদ্ভুত যেটা, সেটা হল, কলতানকে জড়িয়ে এই নিয়ে কোনো তদন্ত করা যাবেনা, নির্দেশ ছিল কার্যত এইরকমই। ঠিক কাছাকাছি আরেকটা নির্দেশ এসেছিল আদালত থেকে, এর আগে, ছাত্রসমাজের নেতাদের গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গে। এই দুটো রায়ে অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। এবং আরও আশ্চর্য এই, যে, এর বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ কোনো আপিল করেনা।

একই দিনে (বা আগের দিন রাতে) সামনে আসে ১৪ ই আগস্ট রাতের হামলার প্রসঙ্গও। এই নিয়ে খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে তদন্ত এবং গ্রেপ্তার শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু দু-এক দিন পর থেকেই সেই প্রসঙ্গে আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিলনা। এই দিন একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, কলকাতা পুলিশ ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল ওই কাণ্ডে, তাঁরা জামিন পাননি। এবং কিছু লোক সেই নিয়ে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এরও কয়েকদিন পরে সমাজমাধ্যমে আরও একটা ছবি ভেসে ওঠে, যেখানে জানা যায়, অভিযুক্তরা জামিন পেয়েছেন, এবং তাঁদের মালা পরিয়ে বরণ করছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ঘটনাটার সম্পর্কে কোনো বিশদ বিবরণই আর জানা যায়না। সরকারপক্ষ বিরোধী দলকে ভিলেন বানিয়ে প্রচারও করেনা, বিরোধী দল সরকারি চক্রান্তের অভিযোগে পাড়া-গরমও করেনা। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত নীরবতা।

এই জায়গা থেকেই একটা খটকা ভাসতে থাকে চারদিকে, যে, কোথাও কি তবে কোনো বোঝাপড়া হল? তার সত্যাসত্য কিছু জানার উপায় নেই, কিন্তু ঘটনা হল, আন্দোলনের তীব্রতার এইটাই ছিল তুঙ্গমুহূর্ত। ১৮-১৯ তারিখের পর থেকেই ভাঁটার টান দেখা যায় একটু একটু করে। আন্দোলনের আর কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করা সম্ভব ছিলনা, অথবা কোথাও বোঝাপড়া হয়েছিল, এই দুটো কারণই সম্ভব,

কিন্তু কী জানা অসম্ভব।

ওই দিনই জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি আংশিক ভাবে উঠে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়। আগের দুদিনে কিছু চিঠিচাপাটি বিনিময় ছাড়া বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয়নি। এমনকি এর আগেরদিন বৈঠকের পর ডাক্তাররা খুশি হননি। তারপর মুখ্যসচিব একটি চিঠি দেন স্বাস্থ্যসচিবকে, তাতে মূলত সুপ্রিম কোর্টে বলা কথাগুলোই দ্বিতীয়বার বলা হয়। ডাক্তাররা তার পরে ঠিক করেন পরের দিন কর্মবিরতি আংশিক ভাবে উঠবে। শুক্রবার বিকেল ৩টে নাগাদ ধর্নামঞ্চ থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের একটি মিছিল হবে। তার মাধ্যমেই অবস্থান তুলে নেওয়া হবে। শনিবার থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি পরিষেবায় যোগ দেবেন আন্দোলনকারীরা।

সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন ওঠে, যে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর তো একটা চিঠি ছাড়া নতুন কিছু হয়নি, তাহলে নতুন করে জয়টা হল কোথায়। কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সের সামনের সমাবেশে ডাক্তাররা চারজন পদাধিকারীকে সরিয়ে দেওয়াটাই মূলত জয় হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু অন্য যে দাবি ছিল, সিবিআইকে তাড়াতাড়ি বিচারের জন্য চাপ দেওয়া, সেটায় কোনো ফোকাস দেওয়া হয়না। চারজনের কুড়ি মিনিটের বক্তৃতায় সিবিআইকে চাপ দেবার প্রসঙ্গ আসে মাত্র একবার, বাকি পুরোটাই রাজ্য সরকার সম্পর্কিত। সিবিআইকে আদৌ কোনো ডেপুটেশন দেওয়াও হয়েছে কিনা, বা তার মিনিটস আছে কিনা, এ নিয়ে কিছু বলা হয়না। সম্ভবত দেওয়া হয়নি। বস্তুত জুনিয়ার এবং সিনিয়ার ডাক্তাররা হাতে গুণে কয়েকবার সিবিআই দপ্তরে গেছেন, কী বলেছেন, কী দাবি কখনই জানা যায়নি। লাইভ স্ট্রিমিং এবং স্বচ্ছতার কোনো প্রসঙ্গ আদৌ আসেইনি।

এইসব খটকা, ভাঁটা এবং অসন্তোষ, সবই একসঙ্গে দেখা যায় সেদিন। বোঝা যায়, এটা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতিমাত্র।

৯। সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল

এরই মধ্যে শিয়ালদা কোর্টে চলতে থাকে বিচারপ্রক্রিয়া। সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। সঞ্জয় রায়, সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল, এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সঞ্জয় মূল অভিযুক্ত। বাকি দুজন সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটে অভিযুক্ত। কিন্তু পরপর দুটি শুনানিতে, খবরের কাগজের রিপোর্টে যা পাওয়া যায়, তা হল, সিবিআই এই দুজনের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজিরই করেনি। শুধু আদালতের কাছে সময় চেয়েছে, তদন্ত করতে হবে বলে। এই দুজনকে অভিযুক্ত বলার মতো কোনো প্রমাণও তাদের হাতে নেই, সেটা স্পষ্ট হতে থাকে।

তৃতীয় শুনানিতে আরও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। নজিরবিহীনভাবে আদালতেই বিক্ষোভ দেখান কিছু আইনজীবী। শোনা যায়, ওই আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অভিযুক্তদের তরফে কেউ মামলা লড়বেন না। সেই ইস্যুতেই বিক্ষোভ। বোঝা যায়, একাংশ মানুষ আইনি প্রক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নন। তাঁদের চাই হাতে-হাতে গণবিচার। নইলে বিচারপ্রার্থীর উকিলের অধিকারের বিরুদ্ধে আইনজীবীরাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, এ জিনিস সম্ভব না।

এরপর সিবিআই-এর আইনজীবী ‘ইন ক্যামেরা’ শুনানির আবেদন জানান। বলেন, আদালতের ভিতরে যেভাবে বিক্ষোভ হচ্ছে, এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা।

উল্টোদিকে অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানান। তিনি সওয়াল করেন, পুলিশের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে গ্রেফতারের আগে অনুমতি চাওয়া হয়নি। সাতবার নোটিস পেয়েই হাজিরা দিয়েছেন তিনি, দুবার মৌখিকভাবে ডাকা হয়েছে, তখনও গিয়েছেন। কোন গ্রাউন্ডে গ্রেফতার, তা এখনও জানানো হয়নি।

সিবিআইএর আইনজীবী জানান, তাঁরা সন্দেহ করছেন, টালা থানায় সাক্ষ্যপ্রমাণ বদলে দেওয়া হয়েছে, রেকর্ড নষ্ট করা হয়েছে (রিমান্ড কপিতে কী লেখা আছে জানা যায়নি, এটা আইনজীবীর বক্তব্য)। তিনি জামিনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সিবিআই নিজের হেফাজতে চায়নি ধৃতদের। বিচারক ধৃতদের জেল হেফাজতে পাঠান। কিন্তু যেটা লক্ষ্যণীয়, তা হল, সিবিআই সাক্ষ্যপ্রমাণ ধ্বংসের

অভিযোগ 'ক্রাইম সিন'এ থাকেনা আর। টালা থানায় চলে আসে।

চতুর্থ দিন আরও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সন্দীপ ঘোষকে আদালতে হাজির করানো হলে তাঁর আইনজীবী বলেন, এর আগে সন্দীপকে নিজেদের হেফাজতে নিলেও জিজ্ঞাসাবাদ আদৌ করেনি এজেন্সি। আদালত অনুমতি দিয়েছিল যে, সন্দীপকে যখন সিবিআই জেরা করবে, তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন তাঁর আইনজীবী। সন্দীপের আইনজীবীর বলেন, তাঁকে ডাকাই হয়নি। তা হলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে জেরা করা হল কখন? এছাড়াও তিনি বলেন, যে, সন্দীপের কোনও বয়ানই রেকর্ড করা হয়নি।

এর পরে সন্দীপ যে বয়ান দিয়েছেন, তা দেখতে চান বিচারক। সিবিআইয়ের আইনজীবী কেস ডায়েরি দেখতে থাকেন। কিন্তু বয়ান কোথায় রয়েছে, তা খুঁজে আর দেখাতে পারেনি তিনি। এরপর সিবিআই সন্দীপকে আর হেফাজতে চায়নি। তাঁকে আবার জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। বোঝা যায়, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে।

এ সব চলতে থাকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত। সংগঠিত-অপরাধ ন্যারেটিভ যাঁরা ছড়াচ্ছিলেন, এ সবই তাঁদের কাছে বিপর্যয়ের সামিল। ফলে সেই শিবিরে আলোড়ন দেখা যায়। এতদিন তিলোত্তমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁকে বাতিল করে বৃন্দা গ্রোভারকে নতুন উকিল হিসেবে নিযুক্ত করে পরিবার। তাঁর অপরাধ জানা যায়না। খুব সম্ভবত আন্দোলনকারীদের একটা অংশ তাঁদের বুঝিয়েছিলেন, যে, মামলা ঠিক করে চালানো হচ্ছে না। একটা মহল থেকে অবশ্য বলা হয়, সেটা আসলে বৃন্দা কারাতের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরে জানা গেছে, তেমন না এবং বিকাশরঞ্জন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বিষয়টায়।

এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ফাঁস হয় আরও কিছু বিস্ফোরক নথি। এতদিন ময়নাতদন্তে অনিয়ম নিয়ে চাপান-উতোর চলছিলই। কেন আরজিকরে, কেন দেরি করে, নিয়মমাফিক হয়েছে কিনা ইত্যাদি। 'ফাঁস' হওয়া একটা চিঠিতে থেকে দেখা যায়, আরজি করেই ময়নাতদন্তের দাবি জুনিয়ার ডাক্তারদের এবং নির্যাতিতার বাবার। আরজি করের অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে জুনিয়ার ডাক্তারদের পক্ষ থেকে লেখা ওই চিঠিতে হলা হচ্ছে, তাঁরা যে জিনিসগুলি চান বা সহমত পোষণ করছেন, তা হলঃ

১. জুডিশিয়াল ম্যজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আরজি করেই ময়নাতদন্ত হবে।
২. পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিওগ্রহণ হবে।

৩. টিমে একজন ময়নাতদন্ত শল্যচিকিৎসক এবং অন্তত দুজন মহিলা শল্যচিকিৎসকের উপস্থিতি থাকবেন।
৪. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তদন্ত চাই।
৫. চারজন মহিলা জু-ডা উপস্থিত থাকবেন ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ায়।

এতে সই করেন মৃতার বাবা, জনৈক সঞ্জীব মুখার্জি (সম্ভবত প্রতিবেশী), এছাড়াও জুনিয়র ডাক্তাররা (তাঁদের তরফে কারা পড়া যাচ্ছেনা)। এই চিঠি দেওয়া হয় বিকেল ৩ঃ৫৫ তে। চিঠিতেই সময় উল্লেখ করা আছে।

বস্তুত এই সবকটা দাবির মতোই (চার নম্বরটা বাদ দিয়ে, সেটা ময়নাতদন্ত সংক্রান্ত দাবি নয়) ময়নাতদন্ত হয়। আরও একটা নথি বেরোয়, তাতে সেটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যায়, দাবি মতো পাঁচজন মহিলা জু-ডা উপস্থিত ছিলেন ময়নাতদন্তে। তাঁরা প্রক্রিয়াতে সন্তুষ্ট বলে লিখেছেন। তাঁদের নামও পড়া যাচ্ছে। তিতাস পাল, নম্রতা সাহা, রিয়া বেরা, রমা বেরা, মৌতৃষা গড়াই। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার আন্দোলনের পরিচিত মুখ।

একই সঙ্গে আরও একটা চিঠি ফাঁস হয়। প্রমাণ লোপাট নিয়ে আরেকটা খবর অন্তন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়েছিল, সেটা হল, সেমিনার হলের পাশে একটি ঘরে, টয়লেট, বেসিন ইত্যাদি ভেঙে ফেলা। সেটা থেকেই 'তথ্যপ্রমাণ' লোপ এর স্পেকুলেশন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খুন করে রক্ত-টক্ত ধোওয়া হয়েছিল ওই ঘরের টয়লেটে, ইত্যাদি। ফাঁস হওয়া নথিটা সেই নিয়েই। তাতে দেখা যাচ্ছে, চেস্ট ডিপার্টমেন্টে একটা জয়েন্ট ইনস্পেকশন টিম তৈরি হয়েছিল, তারা রীতিমতো রিপোর্ট তৈরি করে সইসাবুদ করেই এই কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এছাড়াও আরও চারটে কাজ ছিল। তারিখ অনুযায়ী, তার দু-দিন পরে রিনোভেশন শুরু হয়। সিদ্ধান্তে সই করেছিলেন, বিমল পাল (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অরুণাভ দত্তচৌধুরি (লেখা নেই কে), প্রিয়া গিরি (জু-ডা), আলাপন সরকার (জু-ডা), এম ঘোড়ুই (জু-ডা), মনোরমা জানা (স্টাফ নার্স), এন নাহা (সিস্টার ইন চার্জ, চেস্ট ডিপার্টমেন্ট), এম ভৌমিক (সিস্টার ইন চার্জ)।

দুয়ে মিলে যা দাঁড়ায়, তা হল, ময়নাতদন্ত হয়েছে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে, উপস্থিতিতে, এবং তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট। অতএব বেনিয়ম হয়েছে, কথাটা মিথ্যে। পাশের ঘরও ভেঙে ফেলা হয়েছিল, ডাক্তারদের দাবইমাফিক। তাঁরা ইনস্পেকশনও করেছিলেন। অতএব সেখানে বেনিয়ম এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাট, ব্যাপারটাও মিথ্যে। এর পুরোটাই 'সংগঠিত অপরাধ-ধর্ষণ-খুন' তত্ত্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত। শুধু তাইই না, আন্দোলনকারীরা জেনেবুঝেই এই মিথ্যেগুলোকে ছড়াতে

দিয়েছেন, এটা তাঁদের সততার দাবির উপরেও বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। এর আগে যে প্রশ্নচিহ্ন এসেছিল, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে মিথ্যে কথা বলায়, সেটা আরও বড় করে দেখা যায়, এর পরে। কারণ, কার্যত, পরিকল্পনা করে খুন, এবং ধামাচাপা দেবার জন্য সংগঠিত উদ্যোগ, পুরো ন্যারেটিভটাই, দেখা যায় মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে।

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের উপর এত বড় আঘাত এই আন্দোলনে এর আগে আসেনি।

১০। গণমাধ্যমই যখন নেতা

এই ভাবে নিশ্চিত বিজয়কে পায়ে ঠেলে, আন্দোলনকারীরা যখন একটু-একটু করে ব্যাকফুটে যাচ্ছেন, তখন, কার্যত আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় দৃশ্যশ্রাব্য এবং ছাপা সংবাদমাধ্যম। এমনিতেই তাদের সুনাম ছিলনা। এর আগেই একাধিক অলীক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলো আগেই বলা হয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ পাদে, কার্যত সেরকম অজস্র প্রতিবেদন এবং নিবন্ধের বিস্ফোরণ হয়। সংখ্যায় এত বেশি যে সম্পূর্ণ বিবরণ জোগাড় করাই শক্ত (এই লেখাতেই পারা যায়নি)।

উদাহরণ স্বরূপ, আনন্দবাজার পত্রিকায় শুভাশিস ঘটক এবং শান্তনু ঘোষ, পরপর অনেকগুলি প্রতিবেদন লেখেন। সিরিজের প্রথমটায়, ২৫ শে সেপ্টেম্বর, লেখা হয়, তদন্তকারীরা মনে করছেন, আবছা আলোয় ময়নাতদন্ত করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, ওই দিন ময়নাতদন্তে উপস্থিত দু'জন ডোমকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে ময়না তদন্তে গাফিলতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। সিবিআইয়ের এক কর্তার কথায়, "সেমিনার হলে মৃতদেহ থেকে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহে নানা গাফিলতি ধরা পড়েছে। এ বার ময়নাতদন্তের রিপোর্টের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়েও রহস্যজনক পরিস্থিতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।" পরের দিন ২৬ তারিখ, শান্তনু ঘোষ লেখেন, ভিডিওগ্রাফি অস্পষ্ট। কল্যাণী এবং দিল্লি এইমসের বিশেষজ্ঞদের দেখিয়েও স্পষ্ট কিছু বোঝা যায়নি।

২৭ তারিখ, শুভাশিস ঘটক লেখেন, শুধু ময়নাতদন্তই নয়, সুরতহালেও বহু ত্রুটি পেয়েছে সিবিআই। সিবিআইয়ের এক কর্তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয় "২৬ বছরের চাকরি জীবনে এত অবহেলায় তৈরি রিপোর্ট দেখিনি।" এছাড়াও তদন্তকারী সূত্রের দাবি, বিভিন্ন রিপোর্টের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঠান্ডা মাথায় সুকৌশলে ধাপে ধাপে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে।

২৮ তারিখ শুভাশিস আরেকটি বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনেন। ময়নাতদন্তের ক্ষেত্রে এক সিবিআই কর্তাকে উল্লেখ করে জানানো হয়, "সবেতেই গাফিলতি হয়েছে"। কী গাফিলতি? সেটাও সূত্রের খবর অনুযায়ী এই, যে, একজন ডোমকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি, চিকিৎসকরা নিজেরাই করেছেন। এর

চেয়েও বড় ব্যাপার হল, সূত্র বলছেন, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকেও ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়নি বলে শোনা যাচ্ছে। এবং এই সিরিজের সর্বশেষ প্রতিবেদন অক্টোবরের ৩ তারিখে। শুভাশিস ঘটক লেখেন, মৃতার দেহে ২৪ টি ক্ষত ছিল। মার দেওয়া হয়েছিল গণপ্রহারের ধাঁচে। এবং এক সিবিআই কর্তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, "একার পক্ষে অসম্ভব"। খুন করাই আততায়ী বা আততায়ীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তদন্তে ইচ্ছাকৃত ধোঁয়াশা আনতেই ধর্ষণের ঘটনাটা সামনে আনা হয়, এটাও বলেন তদন্তকারী সূত্র। এর সঙ্গে প্রমাণ লোপাট, খারাপ ভিডিওগ্রাফি, ময়নাতদন্তে গাফিলতি, এগুলিও আবার বলা হয়। এছাড়াও বেরোতে থাকে আরও নানা রোমহর্ষক প্রতিবেদন। মৃতের সঙ্গে সঙ্গম, লাশ-পর্নো চক্র, লাশপাচার, পরীক্ষাচক্র, জাল ওষুধ চক্র, জৈব বর্জ্য চক্র, টাকার জন্য খুন, ইত্যাদি প্রভৃতি। অর্থাৎ খুনের খুনের প্রকৃতি, এবং তার মোটিভ দুইই সরবরাহ করে চলে সংবাদমাধ্যম।

সব মিলিয়ে এই গোটা সিরিজ থেকে তৈরি হয় একটা ন্যারেটিভ। যেখানে, গণপিটুনির ধাঁচে খুন করা হয়, যা একার পক্ষে অসম্ভব। সেটাকে ঢাকতে খারাপ ময়নাতদন্ত। বাজে ভিডিওগ্রাফি। এবং সবশেষে প্রমাণ লোপাট। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। আইনি প্রক্রিয়ায় এবং ফাঁস হওয়া নথিতে একদিকে যখন এই ন্যারেটিভটা ভেঙে পড়ছে, ঠিক তখনই সংবাদমাধ্যম সমস্বরে ন্যারেটিভটির প্রচার করে চলেছে। এর আগে সংবাদমাধ্যম এরকম করেনি তা নয়। দিল্লির জেসিকা লাল হত্যামামলাতেই পুলিশ যখন অপরাধী খুঁজে পাচ্ছিলনা, সংবাদমাধ্যমই জোগাড় করছিল প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু তার থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রায় সমস্ত 'খবর'ই দেওয়া হচ্ছিল সিবিআই-সূত্র উল্লেখ করে। তার কাহিনিরেখাটা খুব পরিষ্কার। যদিও আদালতে বা ফাঁস হওয়া নথিতে কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ঘটনা তা নয়। সিবিআই খুঁজে বার করছে আসল 'সত্য'। এবং সূত্রের হাত ধরে গণমাধ্যম সেগুলো আগেই পৌঁছে দিচ্ছে মানুষের কাছে। মানুষের হাল ছাড়ার কিছু নেই। সিবিআই এর হাত ধরে সুবিচার আসছেই।

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত এইভাবেই সিবিআই-সূত্রের বিস্ফোরণ হয় সংবাদমাধ্যমে। সিবিআই তখনও, বা কখনই সরাসরি কিছু জানায়নি। চার্জশিটও পেশ করেনি। কিন্তু অন্তত আন্দোলনকারীদের মধ্যে আশা তৈরি হয়, যে, তাঁদের যে ন্যারেটিভ, তার পক্ষের কিছুই আসতে চলেছে চার্জশিটে। ভয়াবহ নাটকীয় কিছু থাকতে চলেছে। তার আগে আন্দোলন থামিয়ে দেবার কোনো কারণ নেই। আন্দোলন চলুক, সিবিআইয়ের চার্জশিট তো আর কেবল কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরই অন্তিম জয়।

১১। অন্তিম জয়

একদিকে তথ্যপ্রমাণ, এবং অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের সূত্র, এই দুয়ের টানাপোড়েন চলতে থাকে সেপ্টেম্বরের শেষাংশ এবং অক্টোবরের গোড়াতেও। কর্মবিরতি চলছে কিনা, জুনিয়ার ডাক্তাররা আইপিডি-ওপিডি করছেন কিনা এই নিয়ে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার হয়না। সংবাদমাধ্যম যদিও পুরোটাকেই একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া তখনও পুরো উল্টোদিকেই চলছে। সেপ্টেম্বরের শেষেই সুপ্রিম কোর্টের পরের শুনানি হয়। সেখানে ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহকে কর্মবিরতি নিয়ে একাধিক প্রশ্নের সামনে পড়তে হয় এবং তিনি স্পষ্ট করে জানান, ডাক্তাররা আইপিডি-ওপিডি সহ সমস্তরকম কাজ করছেন। রাজ্যসরকার পুরো উল্টো কথা বলে। এই নিয়ে ধোঁয়াশাও ছিল এতদিন। যার বক্তব্যই ঠিক হোক, বোঝা যায়, যে, জুনিয়র ডাক্তারদের এবার কাজে ফিরতেই হবে, আদালতে সেরকমই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন তাঁদের আইনজীবী।

এছাড়াও আরেকটা অদ্ভুত জিনিস ঘটে। সিবিআই মাত্র ২৭ মিনিটের ভিডিও ফুটেজ পেয়েছে কিনা, এই নিয়ে খুবই আলোড়ন চলছিল বিগত কয়েকটি শুনানি জুড়ে। এবার সে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়না। বোঝা যায়, বিষয়টা মিটে গেছে, এবং সিবিআইয়ের হাতে পুরো ফুটেজই আছে। অনেক পরে জানা যায়, মিনিট না, সেটা কয়েকশো ঘণ্টার।

এই অবস্থায়, জুনিয়ার ডাক্তাররা আদালতের জায়গায় গণমাধ্যমের উপর আস্থা রাখেন। এর মধ্যে সাগর দত্ত কলেজে হয়ে গেছে ডাক্তারদের উপর বিক্ষুব্ধ রোগীর আত্মীয়দের একদফা হামলা। সেই নিয়েও সুপ্রিম কোর্টে তরজা হয়েছে। সরকারপক্ষ হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করেও দাবি করেছে, রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেনা। উল্টোদিকে চারদিকে শোনা যাচ্ছে থ্রেট-কালচার নামক এক শব্দবন্ধ। হাসপাতালের এই হামলাও সেই হুমকি সংস্কৃতিরই অংশ। এমতাবস্থায় ডাক্তাররা অন্তিম যুদ্ধের দিকেই ঝাঁপ দেন। অক্টোবরের গোড়ায়, তিন তারিখ ধর্মতলায় শুরু হয় গণ অবস্থান। ঘোষণা করা হয় আমরণ অনশনের। অর্থাৎ, হয় জয়, নয় মৃত্যু। চরম পরিণতির কথা অবশ্য ভাবা হয়নি, শুধু জয়টাই ভাবা হয়েছিল। কারণ,

সিবিআই চার্জশিটে আসতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই। তখনই আইনি পথে এবং রাস্তায় একই সঙ্গে চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হবে।

যাইহোক, জুনিয়র ডাক্তাররা দশ দফা দাবি পেশ করেন সরকারের কাছে। আবারও, আলাদা কোনো নথি প্রকাশ করা হয়নি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দাবিগুলি এইরকমঃ

১. স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নির্যাতিতার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
২. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অক্ষমতা এবং দুর্নীতির দায় নিতে হবে স্বাস্থ্য দফতরকে। নারায়ণস্বরূপ নিগমকে অবিলম্বে স্বাস্থ্যসচিবের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।
৩. রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয় ভাবে 'রেফারেল' ব্যবস্থা (রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া) চালু করতে হবে।
৪. প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে কতগুলি বেড ফাঁকা রয়েছে, তা জানানোর জন্য একটি করে ডিজিটাল মনিটর রাখতে হবে।
৫. প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। সিসিটিভি, ডাক্তারদের জন্য অন কল রুম, শৌচালয়, হেল্পলাইন নম্বর, প্যানিক বোতাম চালু করতে হবে।
৬. হাসপাতালগুলিতে পুলিশি নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। সিভিক ভলান্টিয়ারের বদলে পুলিশকর্মীদের রাখতে হবে দায়িত্বে। নিরাপত্তার জন্য রাখতে হবে মহিলা পুলিশকর্মীদেরও।
৭. হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে যাঁদের বিরুদ্ধে 'ভয়ের রাজনীতি' চালানোর অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যস্তরেও অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে।
৯. প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজগুলির রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি কমিটিতে চিকিৎসক পড়ুয়া ও জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

১০. পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং পশ্চিমবঙ্গ হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগগুলির প্রসঙ্গে দ্রুত তদন্ত শুরু করতে হবে।

দেখাই যাচ্ছে, এতে সুবিচারের প্রসঙ্গ একটা পয়েন্টে, বাকি সবই ডাক্তারদের নিজস্ব দাবি। এগুলোর জন্য আমরণ অনশন কেন দরকার সেটাও বোঝা মুশকিল। কিন্তু আসলে, আগেই যেমন বলা হয়েছে, দাবিগুলো মুখ্য না, আসলে ব্যাপারটা ছিল অন্তিম যুদ্ধ। ডাক্তাররা সেই স্বরে এবং ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন। ভিড়ও হচ্ছিল প্রচুর। প্রায় প্রতিদিনই অবস্থান চেহারা নিচ্ছিলি জনসমাবেশের। আগেই যেমন বলা হয়েছে, সিবিআই চার্জশিটে আসতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই। তখনই আইনি পথে এবং রাস্তায় একই সঙ্গে চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হবে। এ তারই প্রস্তুতি।

১২। চার্জশিট

প্রত্যাশামাফিক, সিবিআই চার্জশিট পেশ করে অনশন শুরু হবার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই। সেটা প্রকাশ্যে আসে অক্টোবরের আট তারিখ। এবং চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স আসে সেখানেই। ক্লাইম্যাক্সই, কারণ, দেখা যায়, পুরোটাই প্রত্যাশার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। খুন এবং ধর্ষণে একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। বহুল প্রচারিত গণ-অংশগ্রহণের লেশমাত্র নেই। অভিজিৎ মণ্ডল এবং সন্দীপ ঘোষ অন্যান্য কারণে অভিযুক্ত হলেও, তাঁদের সম্পর্কে চার্জশিটে প্রায় কিছুই নেই। বলা হয়েছে পরবর্তীতে সম্পূরক চার্জশিটে বলা হবে।

তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, সংবাদমাধ্যম সিবিআই-সূত্র উল্লেখ করেও যা বলেছেন, তা প্রায় সর্বৈব মিথ্যা। এতদিন পড়া যাচ্ছিল, গণপ্রহারের ধাঁচে আঘাত করা হয়েছিল তিলোত্তমাকে, সুরতহাল থেকে ময়নাতদন্ত সর্বত্র চরম গাফিলতি, যেগুলো আগে বলা হয়েছে। কিন্তু চার্জশিটে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। ময়নাতদন্ত, সুরতহাল এবং ভিডিওগ্রাফি, সিবিআই এগুলো নিয়ে, দুদফায় ক্রসচেক করায়। চার্জশিটেই লেখা আছে, এইমস কল্যাণীর এফমটি প্রধান একটি বিশেষজ্ঞ বোর্ড তৈরি করেছিলেন, যারা সুরতহাল এবং ময়নাতদন্তের সময়ের ভিডিওগ্রাফি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ভিডিওগ্রাফির সঙ্গে মিলছে কিনা এই নিয়ে মতামত দেবেন। তাঁরা মতামত দিয়েছেন, এবং তাঁদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, “দেখা গেছে, উল্লিখিত সুরতহাল প্রক্রিয়া এবং ময়নাতন্তের সময়ের ভিডিওগ্রাফি ময়নাতদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে সুসমঞ্জস” ।

এছাড়াও এটা নিয়ে আরেকটা বোর্ডও তৈরি হয়। সিবিআই এর অনুরোধে ডিরেক্টর জেনারাল অফ হেলথ সার্ভিস মেডিকো-লিগাল মতামত দেবার জন্য, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ মেডিকাল বোর্ড গঠন করেন, যাতে এইমস দিল্লি, রামমনোহর লোহিয়া, সফদরজং সহ দিল্লির অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা আছেন। এইমসের ফরেনসিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ আদর্শ কুমার এর চেয়ারম্যান। তাঁরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে অনেকগুলি পয়েন্টের মধ্যে একটি হল, “সুরতহাল ময়নাতদন্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”

এছাড়াও ফরেনসিক সাক্ষ্য নিয়ে সিবিআই ক্রসচেক করে মোট তিনটি জায়গায়। ১৪ তারিখে ক্রাইম সিন থেকে নেওয়া তথ্য, আরজিকরের নানা জায়গার ডিভিআর, অভিযুক্তর ফ্রেশ নানা স্যাম্পল, ময়নাতনন্তের সময় নেওয়া নির্যাতিতার নানা নমুনা, নির্যাতিতার মোবাইল ল্যাপটপ, অভিযুক্তের মোবাইল, পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা ব্লুটুথ নেকব্যান্ড, সবই সিএফএসএল কলকাতা, দিল্লি এবং চণ্ডীগড়ে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তাতে যা ফলাফল পাওয়া যায়, সংক্ষেপেঃ

ক। অভিযুক্তর মূত্রনালীতে বীর্য আছে। সেটা অভিযুক্তের।

খ। নির্যাতিতার স্তনবৃন্তে লালা আছে। সেটা অভিযুক্তর।

গ। ক্রাইম সিন থেকে পাওয় চুল। অভিযুক্তর।

ঘ। অভিযুক্তর মোবাইল এবং ঘটনাস্থলের ব্লু টুথ। পেয়ারিং হয়েছে।

অর্থাৎ ময়নাতদন্ত দুবার এবং ফরেনসিক তিনবার ক্রসচেক করা হয়েছে। এগুলো সবই ভুল হতে হলে ভারতবর্ষের সমস্ত বিশেষজ্ঞদের এই চক্রান্তে যুক্ত থাকতে হবে, যার সম্ভাবনা খুবই কম। এবং যেটা নিশ্চিত করে বলা যায়, যে, সিবিআই সূত্র অমুক বলেছে বলে যা লেখা হয়েছিল, সেগুলো মিথ্যা। সিবিআই ওরকম কিছু বলেনি, ঠিক উল্টো কথা বলেছে, সে তো চার্জশিটেই দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও এর আগে দেড়শো-গ্রাম-বীর্য, ভাঙা-পেলভিক, আরজি করেই ময়নাতদন্ত, সকলের অগোচরে দেয়াল ভেঙে ফেলা, ইত্যাদি আরও নানা জিনিস বলা হয়েছিল, রটেছিল, সেগুলো মিথ্যে তো আগেই দেখা গেছে। ফলে সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, সিবিআই-সূত্র উল্লেখ করে তৈরি হয়েছিল একটা ন্যারেটিভ। যেখানে, গণপিটুনির ধাঁচে খুন করা হয়, যা একার পক্ষে অসম্ভব। সেটাকে ঢাকতে খারাপ ময়নাতদন্ত। বাজে ভিডিওগ্রাফি। এবং সবশেষে প্রমাণ লোপাট। চার্জশিটে তেমন কিছু নেই। সিবিআই সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছে। এবার, সিবিআই-সূত্র কোনো কারণে সাংবাদিকদের মিথ্যে বলেছিলেন, নাকি সূত্র ব্যাপারটাই বানানো, বোঝা সম্ভব না, কিন্তু "সিবিআই অমুক বলেছে" দাবিগুলো যে মিথ্যে আর সে নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকেনা। একই ভাবে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবর্ণ গোস্বামী, বা রঞ্জন ভট্টাচার্য যা বলেছিলেন, তাও দেখা যায় চার্জশিটের পুরো উল্টোদিকে। এই 'তথ্য'গুলিও তাঁদের স্বকপোলকল্পিত নাকি তাঁদের জানানোই হয়েছিল ভুল কিছু, সে জানার আর উপায় নেই।

এটা চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে চালিয়ে যাওয়া আন্দোলনের উপরই চূড়ান্ত আঘাত। কারণ, সব কিছু দাবি মেনেই হয়েছে, সিবিআই তদন্ত করছে, সুপ্রিম কোর্ট তদারকি করছে, বস্তুত এর পরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার আর কোনো অর্থই থাকেনা। তার চেয়েও বড় ব্যাপার হল, সিবিআই বস্তুত কলকাতা পুলিশের

সংগ্রহ করা সাক্ষ্যগুলিকে দুই বা তিনবার যাচাই করা ছাড়া আর নতুন কিছু আবিষ্কারও করতে পারেনি। কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল একদিনের মধ্যে। সিবিআই চার্জশিট পেশ করতে সময় নিয়েছে প্রায় দুমাস। কার্যত, বিনীত গোয়েলের নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশ যে অসাধারণ কাজ করেছিল, এটা তার অকাট্য সাক্ষ্য। তাঁকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্দোলন করে। এতে করে আঙুল কলকাতা পুলিশের দিকে সরে শুধু যায় তাই নয়, বরং ঘুরে আন্দোলনকারীদের দিকেই ওঠে। চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যাশার মধ্যেই বেজে ওঠে পরাজয়ের সুর। এবং ঘটনাচক্রে তিলোত্তমার মৃত্যুর দুই মাস পূর্ণ হয়।

১৩। খেলা ভাঙার খেলা

আন্দোলন যে এর পরে একদিনেই স্তিমিত হয়ে গেল, তা অবশ্যই নয়। চূড়ান্ত গতিতে চলা গাড়ির থামতেও কিছু সময় লাগে। থেমে যাবেই, এও নিশ্চিত করে বলা যায়না, হয়তো নতুন জ্বালানির সন্ধান পেয়ে গেল। এক্ষেত্রেও অনশন চলতে থাকে, এবং জমায়েতও। শহুরে মধ্যবিত্তের গন্তব্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় ধর্মতলা। নানা বর্ণের খ্যাতনামারা এতদিন ধরেই সক্রিয় বা আধাসক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীতে থাকছিলেন। এবার ধর্মতলায় চাঁদের হাট বসে যায়। প্রায় প্রতিটা স্লোগান, প্রতিটা বক্তৃতার সরাসরি সম্প্রচার হতে থাকে টিভিতে। নতুন একটা চমৎকার বাংলা শোনা যায়, দ্রোহ। এটাও অবশ্য বাংলাদেশ অনুপ্রাণিত। সেখানে হাসিনা-পতনের আগে একটি দ্রোহযাত্রাও হয়েছিল।

এই সময়, পরপর কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে, যেটা মূলত পটপরিবর্তনের নাটক। প্রথম থেকেই এই পর্বে প্রস্তুতির অভাব ছিল। খুব সম্ভবত চূড়ান্ত বিজয় আসন্ন, ভেবে আমরণ অনশনের ডাক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই লম্বা সময় অনশন করতে হবে ভাবা হয়নি। যে কারণে, ব্যাপারটা আমরণ অনশনের জায়গায় রিলে অনশনের দিকে চলে যাচ্ছিল। কয়েকদিন অনশনের পরই এক এক জন করে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, তাঁদের এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, জায়গা নিচ্ছিলেন অন্য কেউ, যদিও অনশনকারীদের তরফ থেকে জানানো হচ্ছিল, এটা আমরণ অনশনই, রিলে নয়। আন্দোলনকারীদের দাবিও খুব স্পষ্ট ছিলনা। দশ-দফা দাবি আগেই লেখা হয়েছে, তার একটি মাত্র পয়েন্ট, সুবিচার সংক্রান্ত, সেটাও সিবিআইয়ের আওতাধীন। বাকি সবকটাই ডাক্তারদের নিরাপত্তাজনিত। এটা আদায়ের জন্য আমরণ অনশন কেন, বোঝা মুশকিল। জুনিয়ার ডাক্তারদের তরফে অবশ্য বারবার বলা হচ্ছিল, নিরাপত্তার দাবিটাও সুবিচারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা চান তিলোত্তমার বিচার এবং ভবিষ্যতে যেন তিলোত্তমাকাণ্ড আর না ঘটে তার ব্যবস্থা। তাতেও আমরণ অনশন কেন, আর আমরণ হলে পাত্রপাত্রী বদলে যাচ্ছে কেন, বোঝা যায়নি।

এরই মধ্যে আট তারিখ চার্জশিট প্রকাশ্যে আসে, যেটা জয়-আসন্ন ধারণার উপরে একটা বিরাট আঘাত। সেইদিনই আরজি করের সিনিয়ার ডাক্তাররা এক

নাটকীয় কাণ্ড ঘটান। জুনিয়র ডাক্তারদের আমরণ অনশনকে সংহতি জানিয়ে আরজি করের ৫০ জনের বেশি সিনিয়র ডাক্তার গণ-ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানা যায়। নাটকীয় সেই গণ ইস্তফার পরেই অভূতপূর্ব ছবি দেখা যায় আরজি কর হাসপাতালে। ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটেও। দেখা যায়, যে, হল থেকে সিনিয়র ডাক্তারেরা গণ ইস্তফায় সই করে বার হচ্ছেন, বাইরে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে তাঁদের 'গার্ড অফ অনার দিচ্ছেন' জুনিয়র ডাক্তারেরা। কলকাতা মেডিকালেও কিছু চিকিৎসক রাজ্য সরকারকে ২৪ ঘন্টা সময় দিয়ে গণ-ইস্তফার হুমকি দেন।

এসবের পরিকল্পনা চার্জশিট জমা পড়ার আগেই হয়েছিল কিনা বলা মুশকিল। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ চূড়ান্ত বিজয় আসন্ন, সমস্ত দিক থেকে চাপ দেওয়া যাক, এটা চার্জশিটের পরে ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, চার্জশিটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মিডিয়া-নির্ভরতা, এবং কার্যত মিডিয়ার হাতে আন্দোলনের রাশ তুলে দেওয়া সম্পূর্ণ ব্যাকফায়ার করে। চার্জশিট সংবাদপত্রের ধারাবিবরণীর ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। এবং কার্যত দেখা যায়, গণ-ইস্তফার ব্যাপারটাও আমরণ অনশনের মতোই ফাঁকা আওয়াজ। একজন চিকিৎসকও আসলে ইস্তফা দেননি। পুরোটাই প্রতীকী। আমরণ অনশনের মতোই।

এর পরে কোনো সরকারের চাপে বা ভয়ে থাকার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। মুখ্যসচিব নবান্ন থেকে অনশন তুলে নেবার আহ্বান জানান, কিন্তু কোনো দাবি মেনে নেবার কথা বলা হয়নি। অনশনমঞ্চে যদিও ভিড় হচ্ছিল ভালই, কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের উপরই বাড়তে থাকে চাপ। একটু কি হঠকারিতা হয়ে গেল? তদন্ত করছে, সিবিআই, কিন্তু সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে কোনো দাবি নেই কেন? ইত্যাদি।

এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় পুজোও। নয় তারিখ ছিল ষষ্ঠী, সেদিন মুখ্যসচিব অনশনকারীদের ডাকেন। আলোচনা হয়। কার্যত মুখ্যসচিব কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, বরং নিজেরা নিরাপত্তারক্ষার কাজে কী অগ্রগতি করেছেন, তারই খতিয়ান দেন। বৈঠক ব্যর্থ হয়, জুনিয়ার ডাক্তাররা অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। পুজো মণ্ডপে স্লোগান দেবার জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একই দিন বিরাট মিছিল হয় সল্ট লেকের সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত, যেখানে সিবিআই এর কার্যালয়। সিবিআইয়ের কাছে কোনো দাবি করা হয়েছে কিনা, যথারীতি জানা যায়না।

পরের দিন, সপ্তমী, আরও দুজন অনশনকারী অনশন তুলে নেন। প্রথমসারির মুখদের মধ্যে অনিকেত মাহাতো ছিলেন অনশনে, তিনি তুলে নেন। দুজনকেই আরজিকরে ভর্তি করা হয়। আরজিকরে শুরু হয় নয়া বিতর্ক - রক্তমাখা গ্লাভস।

কোনো একজন জুনিয়ার ডাক্তার সাপ্লাই করা গ্লাভস খুলে দেখেন, তাতে রক্তের ছিটে। সেই নিয়ে আন্দোলনকারীরা খুবই হইচই করেন। কয়েকদিন পরে অবশ্য দেখা যায়, ওটা রক্ত নয়, কোনো এক রাসায়নিকের দাগ। এমনকি গ্লাভসটা সরবরাহ করা ব্যাচেরও না। কে গ্লাভসটা আনল, সে নিয়ে তদন্ত হবার কথা ছিল, কিন্তু তার ফলাফল জানা যায়নি।

সপ্তমী রাত থেকেই কলকাতা উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠেই। অষ্টমীর দিনও। একই সাথে গন্তব্য হয়ে ওঠে অনশনমঞ্চও। এ যেমন আরেকটা মণ্ডপ। অনশনের এলাকায় উপস্থিত হন বাম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব। সে নিয়ে কিছু জটিলতা হয়। সেটা কতটা জটিল তখন বোঝা যায়নি, কিন্তু আন্দোলনের নেতা কিঞ্জল নন্দ একটা তীব্র বক্তব্য রাখেন, যার মোদ্দা কথা হল, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আন্দোলন হাইজ্যাক করার চেষ্টা হচ্ছে। মূলত বাম সমর্থকরা এই নিয়ে কিঞ্জল নন্দকে ট্রোল করতে শুরু করেন। আন্দোলনে আরেকটা ফাটল তৈরি হয়। মুখ্যসচিব এইদিনও অনশন তুলে নিতে আবেদন করেন, কিন্তু তার কোনো ফল হয়নি। অনশন মঞ্চে তখনও ভিড় উপচে পড়ছে।

পরের দিন আরও দুজন জুনিয়ার ডাক্তার অনশন তুলে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন আরও একজন। এই প্রবণতা অনশনের প্রথম থেকেই। ফলে চাপ যা তৈরি হয়, তা অনশনকারীদের উপরেই। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে এই প্রথম। ১৫ তারিখ সিনিয়ার ডাক্তাররা ডাক দেন মানববন্ধনের। ওই দিনই পুজোর কার্নিভ্যাল। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরাম সেদিনই ডাক দেয় পাল্টা কার্নিভ্যালের। তার নাম দেওয়া হয় দ্রোহের কার্নিভ্যাল। আর জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশনমঞ্চ থেকে তার আগেরদিন সিবিআই চার্জশিটের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে রাজভবন অভিযানের ডাক দেন। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে এইটা না করে উপায় ছিলনা। রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া নিয়ে অবশ্য আরেকপ্রস্থ জল ঘোলা হয়। রাজ্যপাল আনন্দ বোসের বিরুদ্ধেই নারী-হেনস্থার অভিযোগ আছে। কিন্তু সাংবিধানিক পদের কারণে পুলিশি তদন্ত এগোয়নি। এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো লাইভ স্ট্রিমিং ইত্যাদির তো দাবি করা হয়ইনি, এমনকি কী স্মারকলিপি দেওয়া হবে, সেটাও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সেটা অবশ্য ফাঁস হয়ে যায় সেদিনই। দেখা যায়, জুনিয়ার ডাক্তারদের হোমওয়ার্ক খুবই খারাপ। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তকে তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছেন, খুনের মামলার সঙ্গে। আদৌ সিবিআইয়ের কাছে দাবি নিয়ে তাঁরা কতটা সিরিয়াস, সেই প্রশ্ন ওঠে। বস্তুত, সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারা কেন্দ্রীয় এজেন্সি বা প্রতিনিধিদের কাছে যে তিন-চারবার গেছেন, তখন কী দাবি ছিল, কোনোটাই প্রকাশ করা হয়নি। এই

একটাই প্রকাশিত হয়, তাও ফাঁস হয়ে।

পরের দিনের দ্রোহের কার্নিভ্যাল অবশ্য খুবই সফল হয়। শোনা যায়, এই জমায়েত ছিল মূলত বামদের জমায়েত। রাজ্য সরকার প্রথমে অনুমতি দেয়নি। পরে হাইকোর্ট থেকে অনুমতি আদায় করা হয়। কলকাতা শহরে পাশাপাশি চলতে থাকে দুটি কার্নিভ্যাল। একটি সরকারি, গোছানো। এবং অন্যটি স্লোগানে ভরপুর। উদ্দীপনা ছিল প্রচুর, পুলিশ ছিল শান্ত। কোনো গোলমাল হয়নি। এইটাই ছিল এই আন্দোলনের শেষ বড় জমায়েত। প্রশ্ন উঠতে থাকে, এর পরে কী। কারণ, একদিকে অনশন চলছে কার্যত রিলে পদ্ধতিতে, সরকার কোনো চাপ অনুভব করছেনা। চার্জশিটের পর চাপ এমনিই হাল্কা হয়ে গেছে। চাপ বরং আন্দোলনকারীদের উপর, যে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা কিছু করুন। কিন্তু গোটা আন্দোলনের প্রবণতায় কখনই সেই লক্ষণ দেখা যায়নি।

এমতাবস্থায়, সংবাদমাধ্যম আবার নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেন। 'এর পর কি ব্রিগেড?' - এরকম একটা হাওয়া তোলা হয়। একই সঙ্গে রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ধর্ষণের খবরে ফোকাস করা শুরু হয়। আসে কৃষ্ণনগরের খবর। এছাড়াও চলতে থাকে আরও কিছু 'সূত্র'এর খবর। কোনোটাই মিডিয়ার বাইরে তেমন নতুন আলোড়ন তৈরি করেনা। বরং অন্য দুটো খবর হইচই তৈরি করে। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন, আন্দোলনের অন্যতম মুখ সিনিয়ার ডাক্তার, নারায়ণ ব্যানার্জি। আরেকজন মুখ, কুণাল সরকার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে বিবৃতি দেন। কোথাও একটা পিছনের দরজা দিয়ে কথাবার্তা চলছে বোঝা যায়। এমতাবস্থায়, তিন-চারদিন পর, উনিশ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেন আন্দোলনকারীদের। বলেন, সব দাবিই তো মেনে নেওয়া হয়েছে। ওঁরা আন্দোলন বা অনশন (কোনটা, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট না) তুলে নিলে আলোচনায় বসতে পারেন। বস্তুত অচলাবস্থা থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা দেওয়া হয় জুনিয়র ডাক্তারদের। কিঞ্চিৎ টালবাহানার পর, সেটা তাঁরা গ্রহণ করেন।

এই আলোচনার লাইভ স্ট্রিমিং হয়। দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা আবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছেন। জুনিয়ার ডাক্তাররা কিছু চটকদার কথা বলেন বটে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোনো দাবী তো মানেন না। বরং মারাত্মক কিছু কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, উত্তরবঙ্গে ঘেরাওয়ের কথা। ঘেরাও করে চাপ দিয়ে কাউকে পদত্যাগ করানো হয়েছে। আরজিকরের প্রধান ৪৭ (নাকি ৫৯) জনকে সাসপেন্ড করেছেন। তাঁদের আগে জানানো উচিত ছিল। এসবই থ্রেট কালচার। যে যখন পাওয়ারে অন্যজনকে থ্রেট করবেন এটা হবেনা। বোঝা গেল, আরজি করে যে জনাপঞ্চাশকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা আবার ফিরছেন। একই সঙ্গে, আরও খান-তিনেক

গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

১. সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি চলাকালীন ৫৬৩ জন জুনিয়ার ডাক্তার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করে স্বাস্থ্যসাথীর বিলে সই করেছেন। এটা বেআইনি।
২. ৪৫০ কোটি টাকা খরচা হয়েছে কর্মবিরতির জন্য। এটা খুব সম্ভবত বেসরকারি হাসপালের বিল।
৩. কেন্দ্রীয় সরকার ৫০% ওষুধের দাম বাড়িয়েছে।

ইঙ্গিতটা খুব পরিষ্কার। সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি করে বেসরকারি ক্ষেত্রের পেট মোটা করা হচ্ছে। জুনিয়ার-ডাক্তাররাও এই অনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এবং এগুলো আর চলবেনা। জুনিয়ার ডাক্তাররা এর জবাব দিতে পারেননি। এবং অনশন তাঁরা তুলে নেন। আন্দোলনের বস্তুত ওখানেই ইতি।

১৪। বিচার

নিম্ন আদালতে বিচার হতে থাকে নিজের গতিতে। কোনো আলোড়ন ছাড়াই। এর মধ্যে টুকটাক নানা জিনিস ঘটতেই থাকে। অক্টোবরের শেষেই জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন একটা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে, যার নাম জুনিয়ার ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। এতদিন জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টই তাঁদের একমাত্র সংগঠন হিসেবে সামনে এসেছিল, আন্দোলনের নেতৃত্বেও ছিল তারাই। নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশন ফ্রন্টের বিরোধী, এবং শোনা যায়, তারা শাসক দলের মদতপুষ্ট। তারা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনে, অনেকগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল, আরজি করেই গায়ের জোরে জনা পঞ্চাশ জুনিয়ার ডাক্তারকে 'অকর্মণ্য' করে দেওয় হয়েছে। এই খবরটা সংবাদমাধ্যমে বেরিয়েছিল অনেক আগে, এবং মুখ্যমন্ত্রীও আলোচনায় তুলেছিলেন। তবে গায়ের-জোরের অভিযোগটা নতুন। অ্যাসোসিয়েশন এটার বিরুদ্ধে আদালতে যায় এবং পরবর্তীতে আদালতের রায় তাদের পক্ষে যায়। এই জনাপঞ্চাশেক আবার কাজে ফেরেন।

সিবিআইকে চেপে ধরার জন্য চাপও বাড়তে থাকে জুনিয়ার ডাক্তারদের উপরে। অবশেষে নভেম্বরের গোড়ায় ফ্রন্টের জুনিয়ার ডাক্তররা, সাংবাদিক সম্মেলন করে কিছু প্রশ্ন পেশ করেন সিবিআইকে। এই প্রথম সিবিআইকে করা কিছু প্রশ্ন তাঁরা প্রকাশ্যে আনলেন। কিন্তু দেখা যায়, তাতেও হোম-ওয়ার্কের অভাব প্রবল। বস্তুত, পুরো আন্দোলনে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার ডাক্তাররা রেটরিকের বাইরে আর কিছু বলেছেন বলেই শোনা যায়নি। এর তিন সাতেক পরে, জনতার চার্জশিট বলে একটা জিনিস সভা করে পেশ করা হয়। সেও রেটরিকসর্বস্ব। বস্তুত, এই দুটোতে পয়েন্টের অভাব এতই প্রকট, অযত্নের ছাপ এত স্পষ্ট, এবং অগোছালো ভাবে যা খুশি একটা করে দেওয়ার প্রচেষ্টা এত প্রবল, যে, অকারণে আর বিশদ করা হলনা।

অরাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আরও নানা জিনিস ঘটতেই থাকে পরপর। নভেম্বরের মাঝামাঝি বেরোয়, যে, রাতদখলের প্রাথমিক ডাক যাঁদের, তাঁদের একজন, রিমঝিম সিনহা লিংকড-ইন প্রোফাইলে, বায়োডাটার অংশ হিসেবে রাতদখলের আন্দোলনকে যোগ করেছেন। সে নিয়ে বিতর্ক মিটতে না মিটতেই,

তিনি এবিপি আনন্দের সেরা বাঙালির পুরস্কার পেয়ে যান। এবিপি সেবার করে নারীশক্তির আবাহন। কুড়িজন পুরস্কার পান, কুড়িজনই নারী। সেরার সেরা হন রিমঝিম। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং নেতৃত্ব, একটা সময়ে যেমন কার্যত সংবাদমাধ্যমই দিচ্ছিল, একই সঙ্গে আন্দোলনের মুখ হিসেবে এর আগে থেকেই আনন্দ তাঁকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল, যদিও এই তুলে ধরার কাজটা তেমন সাফল্য পায়নি। রিমঝিমও পুরস্কার পাবার পর মূলত সমালোচনার মুখেই পড়েন।

পরের জন, যিনি তীব্র সমালোচনার সামনে পড়েন, আবারও, তিনি কিঞ্জল নন্দ। খুব কাছাকাছি সময়ে তাঁর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যেখানে শক্ত একটি স্টিলের রড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনায় বিখ্যাত 'শিরদাঁড়া'র প্রভাব সুস্পষ্ট। কিঞ্জল অবশ্য বলেন, যে, এর শুটিং হয়েছে আন্দোলনের আগেই। কিন্তু ঘটনা হল, কিঞ্জল অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, কোনো বিখ্যাত মডেল নন। এছাড়াও, শুটিং যবেই হোক, বিজ্ঞাপনের উপস্থাপনায় আন্দোলনের প্রভাব খুব স্পষ্ট।

ঠিক এর পরেই রাজ্যের ছটি আসনে হয় উপনির্বাচন। তাতে দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রী শুধু বিষয়টা সামলে নিয়েছেন নয়, এত বড় আন্দোলনের পর তৃণমূল কার্যত তার ভোট এবং আসন দুইই বাড়িয়েছে। এমনকি শহরতলি নৈহাটি, যেখানে রাতদখলের তীব্র গর্জন শোনা গিয়েছিল, এবং তার ফলশ্রুতিতে দুই বাম দল জোট করে ভোটে লড়েছিল, সেখানেও তাদের ফল শোচনীয়। এটা নানারকম প্রশ্ন তুলে দেয় রাজনৈতিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রী যে মেরুকরণ চাইছিলেন, তাই কি হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গ কি দুই ভাগে ভেঙে গেছে? একদল, যারা ডাক্তারি পড়ে, সরকারি হাসপাতালে চাকরি করে, কিন্তু চিকিৎসা নিতে যায়না, এ আন্দোলন যাদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, তারা কি কেবল সেই শ্রেণিরই? উল্টোদিকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাদের চিকিৎসার জন্য সরকারি ব্যবস্থা ছাড়া গতি নেই, তারা কি সরকারি ব্যবস্থায় খুশি এবং এই আন্দোলনে বিরক্ত? বামরা কি শ্রেণিভিত্তি তৃণমূলের হাতে ছেড়ে দিয়ে উদীয়মান মধ্যবিত্তের শ্রেণিপ্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করেছে? এ সব প্রশ্নের সহজ উত্তর হওয়া সম্ভব না। ফলে অমীমাংসিত।

এর পরেও নানা ঘটনা ঘটতেই থাকে। ডিসেম্বরের শুরুতে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের বেশ কটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য ফাঁস হয়। দেখা যায়, বিপুল অঙ্কের টাকা উঠেছিল, কোটির অঙ্কে। সেটা আশ্চর্য না। কিন্তু সেই টাকার বিরাট অংশই ব্যয় করা হয়নি। কী হবে সেই টাকা দিয়ে? কীইবা তার উৎস? এই নিয়ে বিতর্ক বাধে। কদিনের মধ্যেই আন্দোলনের নেতা আসফাকুল্লা নাইয়ার চিকিৎসা ক্যাম্পের একটি পোস্টার ভাইরাল হয়। দেখা যায়, এমএস পাশ করার আগেই

তাঁর পরিচয় করানো হচ্ছে এমএস এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ঠিক এর পরেই। এতদিন নির্যাতিতার বাবা-মার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন বৃন্দা গ্রোভার। ডিসেম্বরের শুরুতে তিনি আচমকাই কাজটা ছেড়ে দেন। আলাদা করে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে তাঁর বাহিনীর অন্য এক আইনজীবী বলেন, "ওঁদের ধারণা, আইনজীবীদের প্রতিবাদকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের মতো আচরণ করা উচিত। ওঁরা কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই লোকজনকে দোষী সাব্যস্ত করতে চান। এমনকি সিবিআইকেও অভিযুক্ত করতে চান।" তিলোত্তমার বাবা-মায়ের আরেক বরখাস্ত হওয়া উকিল বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন "...আমি মনে করি, পরিবার কারো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, এবং আমার অনুমান, সেটা রাজনৈতিক, কারণ মনে হচ্ছে তাঁরা গ্ল্যামারের পিছনে দৌড়চ্ছেন।" এসব কথা অন্য কেউ বললে হইচই পড়ে যেত। কিন্তু উভয়েই সংবাদমাধ্যমের প্রিয় হওয়ায়, আর এমনিও তেমন কোনো আলোড়ন ওঠার সম্ভাবনা না থাকায়, হইচই হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগটা কাদের নিয়ে, এটাও তাই অমীমাংসিত।

এসবের মধ্যে অবশ্য কয়েকটা নথি আদালতের গোপন বিচার থেকেই ফাঁস হয়ে যায়। সেসব নিয়ে সামান্য আলোড়ন ওঠে। একটায় তিলোত্তমার বাবার বয়ান পাওয়া যায়, দেখা যায়, দুই জায়গার বিবৃতিতে কিছু বদল আছে। আরেকটায় পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞকে পাঠানো সিবিআইয়ের প্রশ্ন ও তার উত্তর। প্রশ্ন ছিল, এই কাজ কি একার পক্ষে করা সম্ভব? উত্তর এসেছে হ্যাঁ। সিবিআই 'লিডিং কোয়েশ্চেন' করছে কিনা এইসব প্রশ্ন ওঠে। তৃতীয় যেটা ফাঁস হয়, সেটা ডিএনএ রিপোর্ট। সেখানে, বিশেষজ্ঞরা দেখে বলেন, বলা আছে, অভিযুক্ত সঞ্জয় রাই ছাড়াও, তিনটে স্যাম্পলে একাধিক ডিএনএ, এমনকি একজন মহিলার ডিএনএও পাওয়া গেছে। রিপোর্টে সম্ভাব্য 'কনটামিনেশন'এর কথা বলা আছে। এই নিয়ে কিছু জল্পনা হয়। কিন্তু যেহেতু এর আগে-পরে কিছুই ফাঁস হয়নি, ফলে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি। তবে এই একটি খটকা ছাড়া, বাকি সব কিছুই অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের দিকেই নির্দেশ করে।

বড়োদিন ঘনিয়ে আসে শহরে, আর গল্পের মধ্যেই যেমন গল্প, এর মধ্যে আবার ঘনিয়ে ওঠে বয়কট বিতর্ক। এতদিন যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে গাল দিয়েছেন, তৃণমূল বা তার সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত অনুষ্ঠানে তাঁদের ডাকার বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তীব্র তৃণমূল বিরোধীরা কেন খামোখা তৃণমূলের মঞ্চে উঠতে লালায়িত হবেন, বোঝা না গেলেও, দেখা যায়, অনেকেই অভিযোগ করছেন। কারণ, বড়দিন আর নববর্ষ ঘনিয়ে এসেছে। রাজ্য জুড়ে আসছে মাচার মরশুম। সেসব জায়গায় তৃণমূলের প্রভাব অপরিসীম। শিল্পীদের উপার্জনের একটা

বড় অংশই ওই মাচার নৃত্যগীত। যাঁরা ভেবেছিলেন আন্দোলন হলে সরকার উল্টে যাবে, কার্যত সেটা না হওয়ায় এবং বস্তুত তৃণমূল শক্তিবৃদ্ধি করায় তাঁদের মাথায় হাত পড়েছে। তৃণমূলের বড় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, দলের এরকম কোনো নীতি নেই। কিন্তু কুণাল ঘোষ পাল্টা দিতে ছাড়েননা। বয়কট তো বটেই, এমনকি ওইসব শিল্পীদের হাতে নয়, ভাতে মারতে হবে, এইসব কথাও শোনা যায়।

এইসবই উপর উপর হতে থাকে। কারণ গণমাধ্যমে অনেকটা জায়গা এইসময় নিয়ে নেয় বাংলাদেশ। তার পরে জানুয়ারি মাসের শুরুতে সরকারি চিকিৎসকের বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের উপর কিছু বিধিনিষেধ চাপানো হয়। যদিও বিধিটা নতুন না, কিন্তু অনেকেই বলেন, এই মুহূর্তে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রতিশোধ নেবার জন্য। এরপর আসে স্যালাইন কাণ্ড। অভিযোগ আসে, 'বিষাক্ত' স্যালাইনে মারা গেছেন দুই প্রসূতি। মেদিনীপুর হাসপাতালে। পাল্টা অভিযোগ আসে, যে, স্যালাইনের কারণে নয়, সিনিয়ার ডাক্তাররা ওই সময় ডিউটি না করে অন্যত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছিলেন। অনভিজ্ঞ জুনিয়ারদের হাতে ছাড়া ছিল দায়িত্ব। তাঁদের হাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। এমনকি কাজটা করার অনুমোদনও তাঁদের ছিলনা। সরকার বারো জনকে এই জন্য সাসপেন্ড করেন। একই সঙ্গে আসফাকুল্লা নাইয়ার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়, ভুয়ো ডিগ্রি দিয়ে চিকিৎসা করার অভিযোগে। অভিযোগটা করেছিল, শোনা যায়, জুনিয়ার ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশন, যারা ফ্রন্টের বিরোধী। পরে ২২ শে জানুয়ারি, পিজিটি চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার বিরুদ্ধে মামলায় হাইকোর্টে ভর্ৎসিত হয় পুলিশ। মামলার ওপর জারি রয়েছে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ। অনেকটা কলতান মামলার মতই হয়তো ঠান্ডাঘরে চলে গেলো এই মামলাও। পুলিশের তরফেও উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা শোনা যায়নি।

এই সব নিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই ঘনিয়ে আসে রায় ঘোষণার তারিখ। ১৮ই জানুয়ারি, শনিবার, ঘটনার ঠিক পাঁচ-মাস নয়-দিন পরে, শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয় রাইকে খুন ও ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। রায়ের পর সঞ্জয় রাই নাকি নিজের রুদ্রাক্ষ নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন। ঠিক কী বলেছিলেন, তার ভিন্ন ভিন্ন বয়ান আছে। কিন্তু বিচারক সোমবার সেসব কথা শুনবেন, এবং সাজা ঘোষণা করবেন জানান। সাজা ঘোষণা হয় দুদিন পর। রায়ও আপলোড করা হয় সেদিনই। বিচারক একমাত্র দোষী হিসেবে সঞ্জয় রাইকে চিহ্নিত করেও বলেন, ঘটনাটা বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়, অতএব ফাঁসি নয়, দেওয়া হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একই সঙ্গে মৃতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ নেবার নির্দেশও জারি হয়।

এই রায়ের পর কিছু মহলে কার্যত শোকের ছায়া নেমে আসে। কারণ, বহু লোকে মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, এই যে বহুচর্চিত ন্যারেটিভটি মিডিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভ করে ফেলেছিল, তার মৃত্যু আগেই হয়েছিল। কিন্তু এতে কার্যত জিনিসটার কফিনে শেষ পেরেক পড়ে। কেউ কেউ অবশ্য বলতে থাকেন, বিচার শেষ হয়নি। পরিপূরক চার্জশিট আসবে। কিন্তু সেটা এলেও কেবলমাত্র প্রমাণ-লোপাটের অভিযোগে। খুন এবং ধর্ষণের সরাসরি অভিযোগ এখানেই পরিসমাপ্ত।

১৫। অন্যান্য বিষয়গুলি

কিন্তু বহু লোকে মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, এই যে বহুচর্চিত ন্যারেটিভই তো কেবল এই আন্দোলনের একমাত্র বিষয় নয়। অনেকগুলি জরুরি বিষয়, সরকারি অব্যবস্থা, দাবি-দাওয়া, সবই উঠে এসেছিল এই আন্দোলনে। প্রায় সবকটাই জরুরি এবং আলোচনার যোগ্য ছিল, যা হারিয়ে যায়, মাত্র কয়েকমাসের কালের গর্ভে। আন্দোলন যখন তীব্রতার চরমে, সরকারের তরফে সতেরো দফা ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল আগস্ট মাসে। ঘটনার ঘনঘটায়, তাদের কী হাল হয়েছে, আমাদের তেমন জানা নেই। নিচে সেই সতেরো দফা ঘোষণার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

১. কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্রামকক্ষ এবং শৌচালয়।
২. রাতের শিফটের কর্মরতা মহিলাদের জন্য রাত্তিরের সাথী নামক নিরাপত্তাবাহিনী।
৩. কর্মস্থলে সিসিটিভিসহ মহিলাদের জন্য সেফ জোন।
৪. রাতের শিফটে কাজ করা মহিলাদের জন্য রাত্তিরের সাথী অ্যাপ।
৫. যেকোনো বিপদে পুলিশকে ফোন ১০০ অথবা ১১২ নম্বরে।
৬. কেউ মত্ত কিনা জানতে হাসপাতালে রাতে নিঃশ্বাস পরীক্ষার ব্যবস্থা।
৭. বিশাখা কমিটিকে সক্রিয় করায় জোর।
৮. নারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানে সকলকে সংবেদনশীল করায় জোর।
৯. রাতে মেয়েদের দল হিসেবে কাজ করায় জোর।
১০. রাত্তিরের সাথী আচরণবিধি মানতে আর্জি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকেও।
১১. হাসপাতাল, কলেজ এবং হস্টেলে রাতে মহিলা পুলিশের টহল।
১২. হাসপাতালের প্রতিটি তলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা।
১৩. হাসপাতালে বাধ্যতামূলভাবে গলায় পরিচয়পত্র ঝোলানো।
১৪. নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি হাসপাতাল এবং কলেজে পুলিশি নিরাপত্তা আধিকারিক নিয়োগ।

১৫. কোনো পরিস্থিতিতেই মহিলা চিকিৎসকদের ১২ ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবেনা।
১৬. যতদূর সম্ভব মহিলাদের রাতের শিফট থেকে অব্যাহতি।
১৭. সমস্ত হাসপাতালে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ।

এর মধ্যে ১৫ এবং ১৬ নম্বর নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। সরকার ১৬ নম্বরটা প্রত্যাহার করে বলেও সংবাদমাধ্যমে জানা যায়। বাকি ১৫ টা ঘোষণার কী হল, কেউ জানেনা। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। কিন্তু কেউ তুলছেন বলেও জানা নেই।

একই ভাবে যে দশদফা দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে মোটামুটিভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা, তাদেরও প্রায় একই হাল। লেখায় এই দশদফা আগেও দেওয়া হয়েছে, তবু, আরেকবার দেওয়া হল নিচে।

১. স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নির্যাতিতার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
২. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অক্ষমতা এবং দুর্নীতির দায় নিতে হবে স্বাস্থ্য দফতরকে। নারায়ণস্বরূপ নিগমকে অবিলম্বে স্বাস্থ্যসচিবের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।
৩. রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে কেন্দ্রীয় ভাবে 'রেফারেল' ব্যবস্থা (রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া) চালু করতে হবে।
৪. প্রতিটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে কতগুলি বেড ফাঁকা রয়েছে, তা জানানোর জন্য একটি করে ডিজিটাল মনিটর রাখতে হবে।
৫. প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কলেজভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। সিসিটিভি, ডাক্তারদের জন্য অন কল রুম, শৌচালয়, হেল্পলাইন নম্বর, প্যানিক বোতাম চালু করতে হবে।
৬. হাসপাতালগুলিতে পুলিশি নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। সিভিক ভলান্টিয়ারের বদলে পুলিশকর্মীদের রাখতে হবে দায়িত্বে। নিরাপত্তার জন্য রাখতে হবে মহিলা পুলিশকর্মীদেরও।
৭. হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে যাঁদের বিরুদ্ধে 'ভয়ের রাজনীতি' চালানোর অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যস্তরেও অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে।

৯. প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজগুলির রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি কমিটিতে চিকিৎসক পড়ুয়া ও জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

১০. পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং পশ্চিমবঙ্গ হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগগুলির প্রসঙ্গে দ্রুত তদন্ত শুরু করতে হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে এগুলো নিয়ে কী করা হয়েছে, তার কোনো ঘোষণা কোথাও নেই। বিষয়টা যেন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

১৬। শিক্ষা, ফলাফল, ইত্যাদি

এই অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে কোনো অগ্রগতি না হওয়া, বা হলেও খবর না থাকা, এবং সেই সংক্রান্ত দাবীদাওয়ার অভাব, এগুলো মূলত জানুয়ারি মাসের সময়সীমার হিসেবে বলা হল। কারণ, এই ধারাবিবরণী মূলত নিম্ন আদালতের রায়ের সঙ্গেই শেষ করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এখানেই থেমে যাবে, ভাবার কোনো কারণ নেই। সমাজমাধ্যমে এখন প্রতিনিয়ত নায়কের জন্ম হয়, বদলে যায় খলনায়ক, কিন্তু তার মধ্যেও, নিঃসন্দেহে, আরজি কর একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যেতে চলেছে। বৌদ্ধিক সমাজের মধ্যে একটা চওড়া ফাটল তৈরি করেছে এই ঘটনাপরম্পরা। গণধর্ষণ থেকে শুরু করে দলবদ্ধ নৃশংসতা সমেত একটা সুনির্দিষ্ট ন্যারেটিভের পুরোটার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা একদিকে, বাকিরা শত্রুপক্ষে। "যেই দর্শক সেই ধর্ষক" স্লোগান এখন স্তিমিত, কিন্তু তার ফল সুদূরপ্রসারী। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল, এই ভাষ্যের প্রায় পুরোটাই মিডিয়া এবং সমাজমাধ্যম নির্মিত। এর পিছনের কুশীলব কে বা কারা জানার খুব বেশি উপায় নেই। একাধিকজন ডাক্তার, একজন উকিল, কয়েকজন সাংবাদিককে ব্যক্তি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, কিন্তু দলবদ্ধভাবে যে ন্যারেটিভনির্মাণ হয়ে গেল, তার পিছনে ঠিক কোন সামাজিক-রাজনৈতিক কলকব্জা কাজ করেছে, জানা অসম্ভব। এই জনমতনির্মাণের একটা বিপুল অংশ গুজব, যেটা আমাদের সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার কিসসার কথা মনে করিয়ে দেয়। একমাত্র পার্থক্য হল, তিলোত্তমার ক্ষেত্রে গুজবগুলো অনেক বড় মাত্রার, অনেক বেশি ছড়িয়েছে, এবং অনেক বেশি রাজনৈতিক। ছড়াতে অনেকাংশেই সাহায্য করেছে মূলধারার মিডিয়া। এবং গণআন্দোলনের নেতৃত্ব, অ্যাজেন্ডানির্মাণ, সবই তারা কার্যত হাতে তুলে নিয়েছে। মিডিয়ার নেতৃত্বে গুজবনির্ভর গণআলোড়নের একটা প্রোটোটাইপ এখানে তৈরি হয়ে গেল, যা একই সঙ্গে কৌতুহলোদ্দীপক এবং উদ্বেগজনক।

এর কোনো অর্জন নেই তাও নয়। বস্তুত সরকার এবং হাসপাতাল প্রশাসনের খুঁতগুলো, এই আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। একজন সিভিক পুলিশ নির্বিবাদে সরকারি হাসপাতালে ঢুকে একজন কর্মরত ডাক্তারকে খুন এবং ধর্ষণ করে যেতে পারে, এর চেয়ে ভয়াবহ জিনিস হওয়া কঠিন। দেখা গেল সেই

সিভিক পুলিশের ক্ষমতার আড়ম্বরও অন্য পুলিশকর্তার প্রসাদে নির্মিত। তারপর প্রশাসনের তরফে পুরোটাকেই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা, পুলিশের তরফে অজস্র বেনিয়ম, ময়নাতদন্ত পরিকাঠামোর দুরবস্থা, এর কোনোটাই এই আন্দোলন ছাড়া হতনা। বস্তুত কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দেবার মতো জায়গায় যে পৌঁছেছিল আন্দোলন, সেটা এর সাফল্যই বলতে হবে।

একই সঙ্গে, আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার। আন্দোলন যতক্ষণ সুবিচারের দাবিতে চলছে বলে অন্তত মনে হচ্ছিল, ততদিনই তার জোর ছিল। কিন্তু যেহেতু এই বাষ্পের অনেকটাই সংগ্রহ করা হয়েছিল অজস্র নির্মিত গুজবের মাধ্যমে, এবং বহুক্ষেত্রে জেনেবুঝেই গুজবগুলোকে রটানো হয়েছে, বা রটতে দেওয়া হয়েছে, গুজবগুলো গুজব এটা জানার পরই আন্দোলনের শক্তি প্রায় এক লহমায় শেষ হয়ে যায়। এই একবিংশ শতকেও, গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমের ভার্চুয়াল-রিয়েলিটির মধ্যেও, রাজনৈতিক বা সামাজিক সততা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কোনো অর্জন অসম্ভব, সেটাও এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়ে গেল। ভবিষ্যতের সমাজকর্মীরা, গবেষকরা, আশা করা যায় সেটা মাথায় রাখবেন। সেই কাজে এই ছোট্টো পুস্তিকাটি তাঁদের কাজে লাগতে পারে, এই আশাতেই এটা প্রকাশ করা হল।

পরিশিষ্ট

নিম্ন আদালতের রায়

১৮-ই জানুয়ারি শিয়ালদা সেশন আদালত আরজিকর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড মামলায় সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং দণ্ডিত করে ১৭২ পৃষ্ঠার রায় প্রকাশ করে। এতদিন মিডিয়া নিম্ন আদালতের কোনো প্রক্রিয়া নিয়েই প্রায় কোনো সংবাদই প্রায় প্রকাশ করেনি। রায় প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, কার্যত, সমস্ত প্রশ্নেরই নানা ধাপে এক এক করে উত্তর আছে। পুরো রায়টি ১৭২ পাতার একটি নথি যার সম্পূর্ণ অনুবাদ এই পরিসরে করা প্রায় অসম্ভব। রায়ের কিছু অংশের সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হল।

বিচারক অনির্বাণ দাস একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন কারাদণ্ড দেন। সিবিআই রায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার পর প্রায় পাঁচ মাস ধরে চলা বিচারপর্বের শেষে এই রায় ঘোষণা করা হয়। নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পক্ষের আইনজীবী সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের মামলায় সবচেয়ে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। ঘোষণার দিন, বিভিন্ন সংগঠন, যার মধ্যে "অভয়া মঞ্চ" এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনও ছিল, শিয়ালদা সেশন আদালতের বাইরে জড়ো হয়ে ন্যায়বিচারের দাবি জানাতে থাকে। এর আগের শুনানিতে সঞ্জয় দাবি করে সে নির্দোষ, এবং ঘটনায় জড়িত নয়। কিন্তু আদালত ফরেনসিক রিপোর্ট (যাতে দেখা যাচ্ছে যে সঞ্জয় রায়ের ডিএনএ ঘটনাস্থল এবং মৃত চিকিৎসকের দেহে উপস্থিত) ও অন্যান্য সমস্ত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে সঞ্জয় রায়কেই তিলোত্তমা ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ৬৪ ধারা (ধর্ষণ), ৬৬ ধারা (ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য আঘাত করা), এবং

১০৩(১) ধারা (হত্যা)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় (পৃঃ ২০)। উল্লেখ্য যে ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারা মৃত্যুদণ্ড বা আজীবন কারাদণ্ডের বিধান দেয়; ৬৬ ধারা অন্তত ২০ বছরের কারাদণ্ডের কথা বলে, যা কিনা আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে; এবং ৬৪ ধারা অন্তত ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান দেয়, যাও আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বাড়ানো পারে।

সিবিআই অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের জন্য মৃত্যুদণ্ডের দাবি করে এবং জানায় যে এই অপরাধ 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' (রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার) শ্রেণির মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে, রায়ের পক্ষের আইনজীবী মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণের দাবি জানান এবং বলেন যে বর্তমান মামলা বিরলের মধ্যে বিরলতম শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। আদালত রায়ের পক্ষের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের যে মামলাগুলোর ওপর তাঁরা নির্ভর করে সঞ্জয়কে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার দাবী করছেন, সেগুলোর লিখিত বিবৃতি জমা দিতে।

শুনানিতে সেশন বিচারক অনির্বাণ দাস রায়কে তার পক্ষে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেন। এতদিন সঞ্জয় রাইয়ের কোনো বয়ানই পাওয়া যাচ্ছিলনা, আদালতের রায়ে সেটা পাওয়া গেল। আদালতে যে প্রশ্নোত্তর চলে তার কিছু অংশের একটা মোটামুটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। সেশন বিচারক অনির্বাণ দাস সঞ্জয়ের দেওয়া যুক্তি ও ঘটনাপ্রবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান যে মামলার সমস্ত প্রমাণই তার দিকে নির্দেশ করে, তবে, একই সঙ্গে এও জানান যে এই মামলা বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়, এবং রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, যা মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে ন্যায়বিচারের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আদালত মনে করেছে।

আমরা এবার কোর্টের রায়ের কয়েকটি অংশের উপর আলোকপাত করবো। আগেই বলা হলো যে সম্পূর্ণ রায়ের অনুবাদ এই পরিসরে কার্যত অসম্ভব, তবে আগ্রহী পাঠকদের জন্য সেই নথির পূর্ণ প্রতিলিপির একটি সূত্র দেওয়া রইলো লেখার শেষে।

আমরা নিচের অংশে দুটি জায়গা আরেকবার দেখবো। প্রথমটি সঞ্জয়ের বয়ান, যা ঐ নথির ৮৮ পৃষ্ঠার একদম নিচ থেকে চলেছে ১০৮ পৃষ্ঠার একদম উপরিভাগ অব্দি - পুরো প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১০৩টি প্রশ্ন। এর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হ'ল নিচে "সঞ্জয় রাইয়ের বয়ান" শিরোনামে।

এর পরের অংশ অর্থাৎ, ১০৩-১৭২ পাতা, যার শিরোনাম, "ডিসিশন উইথ রিজনস", অর্থাৎ আদালতের রায় ও তার কারণসমূহ। এই শেষ অংশটিই সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর থেকে কয়েকটি অংশ, যথা, তিলোত্তমার সংস্পর্শে আর কেউ ছিলো কি না, অপরাধী একজন না একাধিক এবং সেই একজন অপরাধী কে? রায়ের এই অংশটির, অর্থাৎ কারণসমূহের ভিত্তি প্রথম দিকের ২১ থেকে ১০৩ পাতা, যার শিরোনাম "এভিডেন্স অফ প্রসিকিউশন" - মোট ৬৪৮-টি বিন্দুতে সাজানো সমস্ত সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্ত।

এ ছাড়া রায়ের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ - যা বাদ গেলে অবিচার হবে - সেটি হ'ল কর্তব্যে গাফিলতির জন্য পুলিশ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ময়নাতদন্তের পরিকাঠামোকে ভর্ৎসনা। সেই দিকগুলিও কিছুটা অন্তত আলোচিত হওয়া দরকার এই পরিসরে।

আমরা এই কয়েকটি বিষয়ে আরেকটু বিশদে দেখার আগে রায়ের শুরুর অংশ থেকে একটি অংশ আগে দেখে নি - "পয়েন্টস অফ কনসিডারেশন", অর্থাৎ বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

বিবেচ্য বিষয় মূলতঃ চারটি -

১. ধর্ষণের অভিযোগ: অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর উপর ধর্ষণ করেছেন কিনা, যার মধ্যে তার লিঙ্গ ছাড়াও অন্য কোনও বস্তু বা শরীরের অংশ ভুক্তভোগীর যোনি বা মূত্রনালীতে প্রবেশ করানো হয়েছে।
২. অপরাধের সময় আঘাত: অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর উপর এমন আঘাত করেছেন কিনা, যা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে বা তাকে স্থায়ী ভেজেটেটিভ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।
৩. হত্যা বা মৃত্যুর কারণ: অভিযুক্ত এমন কোনও কাজ করেছেন কিনা, যা ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, অথবা এমন কোনও কাজ করেছেন যা গুরুতর শারীরিক আঘাত ঘটানোর জন্যেই করা হয়েছিল এবং যার ফলে অভিযুক্ত জানতেন মৃত্যু ঘটাতে পারে।
৪. অভিযুক্তের জানা ছিল কিনা যে তার কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং তার ফলে ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

১। সঞ্জয় রাইয়ের বয়ান

প্রশ্ন-১: আমি আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করছি, এবং আপনি উত্তর দিতে পারেন বা নাও দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যে আপনার উত্তর আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?
উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন-২: আপনি কি এই আদালতে সরাসরি বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিত থাকার সময় রেকর্ড করা প্রমাণসমূহ সম্পর্কে সচেতন?
উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন-৩: PW-৩৪ (ইন্সপেক্টর শুভেন্দু দাস) এর প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে সিবিআইয়ের রিকুইজিশনের প্রেক্ষিতে তিনি আপনার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সমস্ত নথি হস্তান্তর করেছিলেন এবং দেখা যাচ্ছে যে ২১.১২.২০১৮ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আপনি সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা Exbt. P-172 (34) হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। (সাক্ষীকে নথি দেখানো হয়েছে) আপনি কী বলবেন?
উত্তর: এটি আমার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার নথি।

প্রশ্ন-৪: আপনার নিয়োগের সাথে সংযুক্ত নথি থেকে দেখা যায় যে ২০০৪ সালে ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জুনিয়র বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রানারআপ হয়েছিলেন। আপনি কি ডানহাতি ব্যক্তি? আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি ডানহাতি এবং এটি সত্য যে আমি ওই বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রানারআপ হয়েছিলাম।

প্রশ্ন-৫: আপনার নিয়োগের সাথে সংযুক্ত নথি থেকে দেখা যায় যে আপনার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে অ্যাকাউন্ট নং ৩৮১৯৩৫২৮০১৭ রয়েছে, যা গোখেল রোড

শাখায় অবস্থিত, এবং আপনি এই অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত লেনদেন বা অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত এসএমএস পান এবং এটি আপনার বেতন অ্যাকাউন্ট। আপনি কী বলবেন?

উত্তর: হ্যাঁ। এটি আমার অ্যাকাউন্ট এবং আমি এই অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত এসএমএস পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন-৬: PW-৩৮ (এএসআই সঞ্জয় রায়) এর প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে আপনি কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন এবং এএসআই অনুপ দত্ত (PW-৩০) আপনাকে পুলিশের বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যদিও আপনি চতুর্থ ব্যাটালিয়নের জন্য গঠিত ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না। আপনি কী বলবেন?

উত্তর: সত্য কথা।

প্রশ্ন-৭: PW-৩৮ (এএসআই সঞ্জয় রায়) এর প্রমাণ থেকে আরও দেখা যায় যে আপনি এএসআই অনুপ দত্ত (PW-৩০) এর নির্দেশ/অনুমতিতে চতুর্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাক ব্যবহার করতেন এবং আপনাকে কলকাতা পুলিশের ওয়েলফেয়ার সেলে বরাদ্দ WB-01-AE-5021 নম্বরের সরকারি বাইকটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আপনি কী বলবেন?

উত্তর: সত্য কথা, যে আমি এএসআই অনুপ দত্তের নির্দেশে ব্যারাক নং ১৪ ব্যবহার করতাম। তবে সংখ্যার আগে থাকা অক্ষরগুলো আমি বর্তমানে মনে করতে পারছি না।

আমি স্বীকার করি যে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে আমি কোনও সরকারি বাইক ব্যবহারের অধিকারী ছিলাম না, কিন্তু এএসআই অনুপ দত্ত আমাকে WB-01-AE-5021 বাইকটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়াও, বাইকটি বিভিন্ন সময়ে অন্য পুলিশ কর্মীরাও ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন-৮: PW-৩৩ (সৌরভ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার) এর প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে রাত প্রায় ১০.৩০টায় আপনি কলকাতা পুলিশের WB-01-AE-5021 নম্বরের সরকারি বাইক ব্যবহার করে উক্ত সাক্ষীর সাথে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আপনি কী বলবেন?

উত্তর: ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ৯.৩০টার পর আমি এবং সৌরভ আরজি কর হাসপাতালে সৌরভের ভাই এবং অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসার জন্য ছিলাম। পরে আমরা WB-01-AE-5021 বাইকটি ব্যবহার করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার রাত ১০.৩০টার পরে হাসপাতালে প্রবেশ করি।

প্রশ্ন-৯: PW-৩৩ এর প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে উক্ত তারিখে রাত প্রায় ১২টায়, যা ০৯.০৮.২০২৪ তারিখ হয়ে যায়, আপনি এবং PW সোভাবাজারের রেড লাইট এলাকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে মদ্যপান করেছিলেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: সত্য কথা যে আমি এবং সৌরভ উক্ত বাইক ব্যবহার করে সোভাবাজার এলাকা অতিক্রম করেছিলাম, তবে আমরা সেখানে মদ্যপান করিনি।

প্রশ্ন-১০: PW-৩৩ এর প্রমাণ থেকে আরও দেখা যায় যে সোভাবাজার থেকে আপনি এবং PW কলকাতা পুলিশের WB-01-AE-5021 নম্বরের বাইক ব্যবহার করে চেতলা এলাকার রেড লাইট এলাকায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে মদ্যপান করেছিলেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: সত্য কথা যে আমরা পথে কিছু ম্যাগি খেয়েছিলাম এবং পরে চেতলার রেড লাইট এলাকায় গিয়ে বিয়ার খেয়েছিলাম।

প্রশ্ন ১১: PW-33 এর সাক্ষ্যে উল্লেখ রয়েছে যে তিনি একজন যৌনকর্মীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু আপনি কোনো যৌনকর্মীর ঘরে প্রবেশ করেননি এবং তখন বিয়ার পান করছিলেন। PW-33 ঘর থেকে ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে দেখেন যে আপনি তখনও বিয়ার পান করছেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা দুজনই বিয়ার খেয়েছিলাম। পরে সৌরভ একজন যৌনকর্মীর ঘরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু সম্ভবত কোনো মতানৈক্যের কারণে ২/৫ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে আসে। এসময়ে আমি বিয়ার খাওয়া শেষ করি।

প্রশ্ন ১২: PW-33 এর সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, চেতলা থেকে আপনি দুজন কলকাতা পুলিশের অফিসিয়াল বাইক WB-01-AE-5021-এ আর জি কর হাসপাতালের দিকে যান এবং আপনি PW-33-কে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মূল গেটে নামিয়ে দেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এটা সত্যি। তবে আমি ওকে বাইক থেকে নামতে বলিনি। ও নিজেই তাড়াহুড়ো করে বাইক থেকে নেমে যায়। আমি অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু

ও শোনেনি এবং চলে যায়। পরে আমি বাইক ঘুরিয়ে তাকে খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাইনি। এরপর আমি আবার আর জি কর হাসপাতালের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি এবং ট্রমা কেয়ার সেন্টারে যাই।

প্রশ্ন ১৩: আর জি কর হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ জব্দ করেছিল এবং সেটি এই মামলায় ম্যাট এক্সিবিট LX হিসাবে প্রমাণ করা হয়েছে। ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ৩টা থেকে ৪টার সময় আপনি PW-33-সহ আর জি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে প্রবেশ করেছেন (আসামির কাছে ফুটেজ দেখানো হয়)। এই ফুটেজ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এই ঢোকার জায়গায় আমি বাইক পার্ক করছি দেখা যাচ্ছে এবং ট্রমা কেয়ার সেন্টারে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে ৩টা ৩৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে আমাকে ট্রমা কেয়ার সেন্টার থেকে বের হওয়া দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন ১৪: কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের একটি সিসিটিভি ফুটেজ PW-33-কে দেখানো হয়, যা রাজবল্লভপাড়ার একটি ফুটেজ এবং তারিখ ছিল ০৮.০৮.২০২৪। সময় ১৬:০৭:২০ থেকে ১৬:০৭:২৫, যেখানে আপনাকে PW-33-কে পিলিয়ন রাইডার হিসেবে নিয়ে একটি পুলিশ বাইক চালাতে দেখা যায় (উক্ত ফুটেজটি ম্যাট এক্সিবিট LV হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আপনাকে দেখানো হয়েছে)। এই ফুটেজ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি স্বীকার করছি যে উক্ত সিসিটিভি ফুটেজে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সৌরভ আমার পিলিয়ন রাইডার ছিল।

প্রশ্ন ১৫: PW-32 (যোগেন্দ্র শ') এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আর জি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে এক বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তার মতে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে, আপনাকে রাত ৩টা ৩৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে প্রবেশ করতে দেখা যায়। আপনার হাতে একটি হেলমেট এবং গলায় একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন ঝুলতে দেখা যায়। এই সাক্ষী সিসিটিভি ফুটেজে আপনাকে শনাক্ত করেছেন, যা এই মামলায় ম্যাট এক্সিবিট LX হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: এটি সত্যি যে এই সিসিটিভি ফুটেজে আমাকে প্রধান গেট দিয়ে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে প্রবেশ করতে দেখা যায়। আমার হাতে একটি হেলমেট এবং গলায় একটি

ব্লুটুথ ইয়ারফোন ঝুলতে দেখা গেছে।

প্রশ্ন ১৬: উক্ত সাক্ষী (PW-32) আরও উল্লেখ করেছেন যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ৩টা ৩৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে আপনাকে ট্রমা কেয়ার সেন্টার থেকে বের হতে দেখা যায়, তখন আপনার হাতে হেলমেট ছিল এবং গলায় ব্লুটুথ ইয়ারফোন ঝুলতে দেখা যায়। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, সত্যি।

প্রশ্ন ১৭: উক্ত সাক্ষী (PW-32) আরও উল্লেখ করেছেন যে, আপনি আর জি কর হাসপাতালের একজন পরিচিত মুখ ছিলেন কারণ আপনি প্রায় নিয়মিতভাবে সেখানে যেতেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি বলতে পারি না কার কাছে আমি পরিচিত ছিলাম, তবে আমি স্বীকার করছি যে, ওয়েলফেয়ার বোর্ডের রোগীদের দেখাশোনার জন্য এএসআই অনুপ দত্তের নির্দেশে আমি আর জি কর হাসপাতালে যেতাম।

প্রশ্ন ১৮: PW-31 (এএসআই সমর পাল)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে ভোর ৪টা ৩ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে, আপনাকে জরুরি বিল্ডিংয়ের ৩য় তলায় চেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রবেশপথে স্থাপিত সিসিটিভিতে দেখা গেছে। উক্ত সাক্ষী সেই সিসিটিভি ফুটেজ (ম্যাট এক্সিবিট LVII) পর্যালোচনা করে বলেছেন, ফুটেজে দেখা যায় যে আপনি সিসিটিভি স্থাপিত পয়েন্ট থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে একটি করিডরে প্রবেশ করেন। তখন আপনার হাতে একটি হেলমেট এবং গলায় একটি ইয়ারফোন ঝুলতে দেখা যায়। আপনি এই ফুটেজ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এই ফুটেজে আমিই আছি। আমার হাতে একটি হেলমেট এবং গলায় একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন ঝুলতে দেখা গেছে। এটি সত্যি যে ফুটেজে আমাকে ডানদিকে মোড় নিয়ে একটি করিডরে প্রবেশ করতে দেখা যায় এবং এরপর ফুটেজে দেখা যায় আমি বামদিকে কোনো একটি জায়গায় প্রবেশ করি, যা সিসিটিভির কাভারেজ এলাকায় ছিল না।

প্রশ্ন ১৯: PW-31-এর সাক্ষ্যে এবং উক্ত সিসিটিভি ফুটেজ (ম্যাট এক্সিবিট LVII) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে ভোর ৪টা ৩১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে আপনাকে চেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হতে দেখা যায়। এরপর আপনি

যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে ঘুরে যান এবং পরে আবার সিসিটিভিতে দেখা যায় আপনি বের হচ্ছেন। তখন আপনার হাতে হেলমেট ছিল কিন্তু গলায় ঝোলানো ব্লুটুথ ইয়ারফোন দেখা যায়নি। এরপর দেখা যায় আপনি বের হয়ে বাম দিকে ঘুরে যান এবং সিসিটিভি কাভারেজ এলাকার বাইরে চলে যান। আপনি এই ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তর: এটি সত্যি যে ফুটেজে যখন আমাকে বের হতে দেখা যায়, তখন আমার হাতে হেলমেট ছিল কিন্তু ব্লুটুথ ইয়ারফোন, যা আমার গলায় ঝুলছিল যখন আমি প্রবেশ করি, তা বের হওয়ার সময় দেখা যায়নি।

প্রশ্ন ২০: এখন এই আদালতের সিস্টেমে উক্ত সিসিটিভি ফুটেজ (ম্যাট এক্সিবিট LVII) আপনাকে দেখানো হচ্ছে। PW-31-এর দেওয়া সাক্ষ্যে আপনার চেস্ট ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ এবং বের হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটেজে দৃশ্যমান। ফুটেজে দেখা যায়, আপনি যখন চেস্ট ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করেন, তখন আপনার হাতে একটি হেলমেট ছিল এবং গলায় ব্লুটুথ ইয়ারফোন ঝুলছিল। তবে বের হওয়ার সময় আপনার হাতে হেলমেট ছিল, কিন্তু ইয়ারফোনটি আর দেখা যায়নি। এই ফুটেজ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী এবং ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে ভোর ৪টা ৩ মিনিট ৩১ সেকেন্ড থেকে ৪টা ৩১ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পর্যন্ত আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিল্ডিংয়ের ৩য় তলার চেস্ট ডিপার্টমেন্টে আপনার উপস্থিতির ব্যাখ্যা কী?

উত্তর: এটি সত্যি।

প্রশ্ন ২১: PW-31 (এএসআই সমর পাল)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টার দিকে আর জি কর পুলিশ আউট পোস্টের ওসি থেকে একটি কল পাওয়ার পর তিনি জরুরি বিল্ডিংয়ের ৩য় তলার চেস্ট ডিপার্টমেন্টে যান এবং সেখানে একটি সেমিনার হলে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন ২২: PW-31-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত প্রায় ৯:৩০ মিনিটে পুলিশ কর্মকর্তারা হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছিলেন এবং সে সময় আর জি কর হাসপাতালে নিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার দিলীপ কুমার সাহা একটি সিসিটিভি ফুটেজে আপনাকে সনাক্ত করেছিলেন। আপনি

এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন ২৩: PW-31-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি প্রায়ই রোগীদের সঙ্গে আর জি কর হাসপাতালে যেতেন এবং সে কারণে PW-31 আপনাকে চিনতেন এবং আপনার যোগাযোগ নম্বর তার কাছে ছিল। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: আমি এএসআই সমর পালের পোস্টিং এর স্থানে এবং তার বাসায় এএসআই অনুপ দত্তের নির্দেশে যেতাম এবং অনুপ দত্তের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, যেমন মদের বোতল, সমর পালের কাছে পৌঁছে দিতাম। সেই কারণে সমর পাল আমাকে চিনতেন এবং আমার যোগাযোগ নম্বর তার কাছে ছিল।

প্রশ্ন ২৪: উক্ত সাক্ষী আরও উল্লেখ করেছেন যে, আর জি কর পুলিশ আউট পোস্টের ওসি-এর নির্দেশে তিনি ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ১০:৩০ মিনিট এবং ১০:৩১ মিনিটে আপনাকে ফোন করে আর জি কর হাসপাতালে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি অস্বীকার করেছিলেন। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: এটি সত্যি যে আমি এএসআই সমর পালের কাছ থেকে কল পেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে আর জি কর হাসপাতালে যেতে বলেছিলেন। তখন আমি এএসআই অনুপ দত্তের সঙ্গে ছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম যে আমি সেখানে যাব।

প্রশ্ন ২৫: PW-31-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি প্রায়ই এএসআই অনুপ দত্তের রেফারেন্সে ওই হাসপাতালে যেতেন এবং সেই কারণে তিনি ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ১০:৩০ মিনিটের পরে এএসআই অনুপ দত্তকে ফোন করে আপনাকে আর জি কর হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: আমি বলতে পারি না সমর পাল ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ১০:৩০ মিনিটের পরে এএসআই অনুপ দত্তকে ফোন করেছিলেন কিনা।

প্রশ্ন ২৬: PW-20 (কনস্টেবল চন্দন ভৌমিক)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে তিনি কলকাতা পুলিশের সল্টলেক ৪র্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে ছিলেন। রাত প্রায় ১০:৩০ মিনিটে এএসআই অনুপ দত্ত তাকে নির্দেশ দেন আপনাকে আর জি কর পুলিশ আউট পোস্টে পৌঁছে দিতে।

তিনি ব্যাটালিয়নের গেটে অপেক্ষা করছিলেন এবং আপনাকে কয়েকবার ফোন করেন। পরে, আপনি গেটে গেলে তিনি তার মোটরবাইকে আপনাকে নিয়ে ওসি, আর জি কর পুলিশ আউট পোস্টে পৌঁছে দেন। এই বিষয়টি PW-30 (এএসআই অনুপ দত্ত) এর সাক্ষ্যে সমর্থিত হয়েছে। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: যখন আমি এএসআই সমর পালের কল পাই, তখন আমরা এএসআই অনুপ দত্তের কক্ষে বসে খাবার খাচ্ছিলাম। আমি অনুপ দত্তকে জানাই যে আমাকে আর জি কর হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছে। তখন অনুপ দত্ত আমাকে সেখানে যেতে বলেন এবং তিনি চন্দন ভৌমিককে নির্দেশ দেন আমাকে আর জি কর হাসপাতালে পৌঁছে দিতে।

চন্দন আমাকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু আমি তখন ওয়াশরুমে ছিলাম বলে কল ধরতে পারিনি। পরে আমি ব্যাটালিয়নের প্রধান গেটে যাই এবং চন্দন তার বাইকে আমাকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রশ্ন ২৭: PW-49 (ইন্সপেক্টর রূপালি মুখার্জি)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে আপনাকে ১০.০৮.২০২৪ তারিখে এই মামলার সাথে সম্পর্কিত গ্রেপ্তার করা হয় এবং ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, তখন আপনার মোবাইল ফোনটি উক্ত সাক্ষী গ্রহণ করেন। তবে ব্যাটারি কম থাকায় এটি টালা থানায় চার্জ দেওয়া হয় এবং পরীক্ষার পর আপনাকে ফেরত দেওয়া হয়। ১০.০৮.২০২৪ তারিখে গ্রেপ্তারের পর এটি PW-26 (এএসআই সঞ্জয় লোহার)-এর উপস্থিতিতে জব্দ করা হয়। এটি ছিল একটি পুরনো নেভি-ব্লু রঙের রেডমি মোবাইল ফোন, যার IMEI নম্বর 864712051844293 এবং 864712051844301 এবং ভিআই সিম কার্ড ছিল। মোবাইলটি মামলায় প্রদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (Mat Exbt. LXX (P-49))। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: এটি আমার মোবাইল ফোন।

০৯.০৮.২০২৪ তারিখে চন্দন ভৌমিকের সঙ্গে আর জি কর হাসপাতালে পৌঁছে, আমি এএসআই সমর পালকে সেখানে পাইনি। আমি তাকে ফোন করি এবং তিনি আমাকে আর জি কর পুলিশ আউট পোস্টে যেতে বলেন। আমি সেখানে যাই।

দুইজন সাদা পোশাকের পুলিশ আমাকে আর জি কর হাসপাতালের একটি হলে নিয়ে যান। সেখানে একজন আইপিএস অফিসার ছিলেন এবং আজ আদালতে প্রদর্শিত সিসিটিভি ফুটেজ (Mat Exbt. LVII) আমাকে দেখানো হয়। আমি ওই ফুটেজে নিজেকে শনাক্ত করি। এরপর আমাকে সেই কক্ষে বসতে বলা হয় এবং

পরে দুই সাদা পোশাকের পুলিশ আমাকে নিয়ে যান। বাইরে এসে দেখি একটি প্রিজন ভ্যান এবং অনেক মিডিয়া ও লোকজন জড়ো হয়েছেন। এটি ০৯.০৮.২০২৪ তারিখের রাত।
আর জি কর থেকে আমাকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।
সে সময় আমার ফোন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি।

প্রশ্ন ২৮: PW-27 (সঞ্জয় দত্ত, ভোডাফোন-আইডিয়া লিমিটেডের বিকল্প নোডাল অফিসার)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিম নম্বর 8991301804790404373, যার সার্ভিস নম্বর 9051461112, আপনার নামে নিবন্ধিত ছিল এবং উক্ত নথি (CAF) প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে (Exbt. P-142 (27))। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: আমি স্বীকার করি যে মোবাইল নম্বর 9051461112 আমার নামে নিবন্ধিত ছিল এবং আমি এটি ব্যবহার করতাম।

প্রশ্ন ২৯: PW-27-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোবাইল নম্বর 9051461112-এর কল ডিটেল রেকর্ডস (CDR) আদালতে Exbt. P-142(27) হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। উক্ত CDR অনুযায়ী, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ২:৩১:২১ মিনিটে উক্ত মোবাইল নম্বরের অবস্থান ছিল ২৪৪ এজেসি বোস রোড, লালা লাজপত রাই সরণি, কলকাতা ৭০০০২০ এবং একই দিনে সকাল ৪:৩৮:৩২ মিনিটে সেটি ১২৩ বিধান সরণি, কলকাতা-০৪ এ অবস্থান করছিল। ওই সময় আপনি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটি এসএমএস পেয়েছিলেন এবং উক্ত টাওয়ার লোকেশন আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাশে ছিল। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: সত্য যে উক্ত সময় আমি আর জি কর হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ধূমপান করেছি এবং পরে হাসপাতালের প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যাই।

প্রশ্ন ৩০: ১০.০৮.২০২৪ তারিখের জব্দ তালিকা অনুযায়ী আপনার মোবাইল ফোনের একটি IMEI নম্বর ছিল 864712051844301, কিন্তু CDR অনুযায়ী উক্ত IMEI নম্বর ছিল 864712051844300। PW-27-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, IMEI নম্বরের প্রথম ১৪টি সংখ্যা সিস্টেম জেনারেটেড CDR-এ অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু শেষ সংখ্যা, যেটিকে 'চেক ডিজিট' বলা হয়, সেটি সর্বদা শূন্যে (০) পরিবর্তিত হয় এবং এটি ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং,

জব্দ করা মোবাইল ফোনের IMEI নম্বর এবং CDR-এর IMEI নম্বর একই। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: আমি কিছু বলতে পারি না কারণ এটি প্রযুক্তিগত বিষয়।

প্রশ্ন ৩১: ২১.১২.২০১৮ তারিখের আপনার নিয়োগপত্র/নির্বাচন তালিকা (Exbt. P-172(34))-এ দেখা যায় যে আপনার মোবাইল নম্বর 9051461112 সেখানে নিবন্ধিত ছিল এবং উক্ত নম্বরটি CDR এবং CAF-এর সঙ্গে মিলে যায়। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: আমার একমাত্র মোবাইল নম্বর 9051461112।

প্রশ্ন ৩২: PW-49 (ইন্সপেক্টর রূপালি মুখার্জি)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিজ্ঞাসাবাদের পর এবং নিশ্চিত হওয়ার পর যে আপনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, ১০.০৮.২০২৪ তারিখে আপনাকে লালবাজারের ডব্লিউজি সেল, ডিডি, কলকাতা পুলিশের অফিসে গ্রেপ্তার করা হয়। যথাযথ গ্রেপ্তার মেমো এবং পরিদর্শন মেমো ইস্যু করা হয় যেখানে আপনার স্বাক্ষর ছিল এবং এটি Exbt. P-205(49) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপনি এ সম্পর্কে কী বলবেন?

উত্তর: হ্যাঁ, এই নথিতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে।

০৯.০৮.২০২৪ তারিখের রাতে আমাকে আর জি কর হাসপাতাল থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডব্লিউজি সেলে নেওয়া হয়। সেখানে সুফিয়া মল্লিক নামের এক ম্যাডাম আমাকে আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র জমা দিতে বলেন। আমি অস্বীকার করলে অন্যান্য কর্মকর্তারা আমাকে বকাঝকা করেন।

এরপর আমি আমার মোবাইল, মানিব্যাগ এবং একটি দেবীর মালা সুফিয়া মল্লিক ম্যাডামের কাছে জমা দিই।

সে রাতে আমাকে লকআপে রাখা হয়নি। আমাকে লালবাজারের একটি অন্য ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সেখানে পুলিশ সদস্যরা আমাকে মারধর করেন। আমার চুল ধরা হয়, আমাকে নগ্ন করা হয় এবং সকালে আমাকে ডিসি স্পেশালের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আমাকে আমার অপরাধ স্বীকার করতে বলেন এবং বলেন তারা সব ব্যবস্থা করে নেবেন।

আমি আমার অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করি। তারপর আমাকে মারধর করা হয় এবং তৎকালীন সিপি বিনিত গোয়েলের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সিপিও আমাকে অপরাধ স্বীকার করতে বলেন এবং জানান তারা সব মেলাবে।

১০.০৮.২০২৪ তারিখে আমাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রশ্ন ৩৩: PW-8 (ডাঃ বিশ্বনাথ সোরেন)-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আপনাকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং পরীক্ষায় আপনার মুখ, বাম উরুর পেছনের অংশসহ বিভিন্ন স্থানে স্ক্যাব অ্যাব্রেশন দেখতে পান। ডাক্তার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আপনার আঙুল এবং বাম হাতের ডোরসাল অংশের আঘাতগুলো রুক্ষ পৃষ্ঠের সাথে ঘর্ষণের ফলে হয়েছে এবং অন্যান্য আঘাতগুলো সুচালো পিনের মতো বস্তুর ডগা বা আঙুল বা পায়ের নখের ঘর্ষণের কারণে হয়েছে। এছাড়া পুরো মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল এবং PW-9 (জয়ন্ত রাজবংশী) উক্ত ভিডিওগ্রাফি প্রমাণ করেছেন [Mat Ext-I(P9)]। (আদালতে সিস্টেমে ভিডিওটি চালানো হয় এবং আসামিকে দেখানো হয়)। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: আমি ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে এএসআই অনুপ দত্তের সঙ্গে সলুয়াতে গিয়েছিলাম এবং ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে ফিরে আসি। সেখানে আমি আরোহণ প্রশিক্ষণের চেষ্টা করেছিলাম এবং সেই সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে কিছু আঘাত পেয়েছিলাম। এই ভিডিওতে দেখানো আঘাতগুলো হয়তো সেই কারণেই হয়েছে। আমার হাতে দেখা আঘাতগুলো আমি সলুয়াতে থাকার সময় পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন ৩৪: PW-37 (ডাঃ অর্দশ কুমার)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিবিআই একটি বহু-প্রতিষ্ঠানিক মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছিল এবং উক্ত বোর্ড PW-8 কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আপনার মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার প্রতিবেদন [Exbt. P-8/1(8)] পরীক্ষা করেছিল। উক্ত বোর্ডের মতে, PW-8-এর নথিভুক্ত আঘাতগুলো ভুক্তভোগীর প্রতিরোধ/সংগ্রামের চিহ্ন। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এটি মিথ্যা মতামত।

প্রশ্ন ৩৫: PW-8 এবং PW-37-এর মত অনুযায়ী, উক্ত আঘাতগুলো আপনার মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে হয়েছে। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এটি মিথ্যা মতামত।

প্রশ্ন ৩৬: PW-8 (ডাঃ বিশ্বনাথ সোরেন) এবং Exbt. P-8/1(8)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০.০৮.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.০০টায় আপনাকে পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত মত অনুযায়ী, আপনার শরীরে পাওয়া আঘাতগুলো ১০.০৮.২০২৪ তারিখের দুপুর ১২.০০টার ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে হয়েছে। গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী, উক্ত সময়কাল পড়ে ০৯.০৮.২০২৪ তারিখের ভোর ৪.০০/৪.৩০টার মধ্যে, যখন সিসিটিভি ফুটেজে আপনাকে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় তলায় চেস্ট ডিপার্টমেন্টে দেখা গিয়েছে। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এই মতামত আমাকে মিথ্যাভাবে জড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৭: PW-49 (ইন্সপেক্টর রূপালি মুখার্জি)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১২.০৮.২০২৪ তারিখে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় আপনার বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল। উক্ত বিবৃতিতে আপনি বলেছেন যে, যদি আপনাকে ৪র্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে আপনি ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে আর জি কর হাসপাতালে থাকার সময় ব্যবহৃত পোশাক ও জুতা উপস্থাপন করবেন। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: আমি এ ধরনের কিছু বলিনি।

প্রশ্ন ৩৮: PW-49-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে আপনাকে সল্টলেকের কলকাতা পুলিশের ৪র্থ ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আপনি ব্যারাকের B 14K নম্বরের একটি পৃথক কক্ষ দেখান যেখানে আপনি থাকতেন। উক্ত কক্ষটি তালাবদ্ধ ছিল এবং আপনি চাবি যেখানে রাখা হয়েছিল তা দেখিয়েছিলেন এবং কক্ষটি আপনার মাধ্যমে খোলা হয়েছিল। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: প্রকৃত ঘটনা হলো, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে লালবাজারে আমার পোশাক খুলে নেওয়া হয়েছিল এবং ১২.০৮.২০২৪ তারিখে এটি সাজানো হয়েছিল। আমরা সাধারণত কক্ষের চাবি এমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখি, যা সবাই জানে এবং যখন আমি লালবাজারে ছিলাম, তখন ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাকে চাবি রাখার স্থান দেখানো হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩৯: PW-49-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আপনার সঙ্গে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং আপনি ঘটনার তারিখে (০৯.০৮.২০২৪)

ব্যবহৃত আপনার পোশাক দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও আপনি মোটরবাইকের চাবি, আপনার জুতা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উপস্থাপন করেন এবং PW-49 যথাযথ বাজেয়াপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে তা বাজেয়াপ্ত করেন এবং আপনি উক্ত বাজেয়াপ্ত তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?
উত্তর: এটি সাজানো ঘটনা।

প্রশ্ন ৪০: উক্ত বাজেয়াপ্ত তালিকা [Exbt. P-215(49)] আপনাকে দেখানো হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি কি উক্ত বাজেয়াপ্ত তালিকায় আপনার স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছেন? আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, উক্ত নথিতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে।

প্রশ্ন ৪১: PW-49-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল এবং উক্ত ভিডিও আদালতে (Mat Exbt. LXXIII) দেখানো হয় এবং এটি আজ আপনাকে দেখানো হয়েছে। উক্ত ভিডিওতে দেখা যায় যে, আপনি আপনার পোশাক, জুতা, মোটরবাইকের চাবি, হেলমেট, চার্জার এবং অন্যান্য সামগ্রী সনাক্ত করেছেন এবং তা আপনার উপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: এই ভিডিও সাজানো।

প্রশ্ন ৪২: PW-49-এর সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, WB-01-AE-5021 নম্বরের মোটরবাইকটি আপনার নির্দেশ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আপনি বাজেয়াপ্ত তালিকায় স্বাক্ষর করেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এটি আমার স্বাক্ষর।

প্রশ্ন ৪৩: আপনার টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট এবং জুতা যথাক্রমে Mat. Exbts. XXVIII, XXVI এবং XXVII ও LXXII হিসাবে প্রমাণ করা হয়েছে এবং এটি আপনাকে দেখানো হয়েছে। আপনি এই পোশাক ও জুতা সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো আমার পোশাক ও জুতা এবং এটি উক্ত হেলমেট (সঠিকভাবে সনাক্ত করা হয়েছে)।

প্রশ্ন ৪৪: PW-8 (ডাঃ বিশ্বনাথ সোরেন)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০.০৮.২০২৪ তারিখে আপনাকে মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন

করা হয় এবং আপনি উক্ত পরীক্ষার জন্য নিজের হাতে লিখিত সম্মতি প্রদান করেন (নথিটি আসামিকে দেখানো হয়েছে)। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এটি আমার হাতের লেখা, কিন্তু আমাকে এটি লিখতে বাধ্য করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ৪৫: PW-12 (ডাঃ অন্তরা বর্মন) এবং PW-24 (এসআই সুব্রত চ্যাটার্জি)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে রাত ৮:৩০ থেকে ১০:৪৫-এর মধ্যে আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের সেমিনার রুম থেকে বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে ছিল নীল এবং কালো রঙের 'লুমা' কোম্পানির ব্লুটুথ ইয়ারফোন যা Mat Exbt. XVII (P-12) হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে (উক্ত ইয়ারফোন আসামিকে দেখানো হয়েছে)। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: এটি আমার ব্লুটুথ ইয়ারফোন নয়।

প্রশ্ন ৪৬: PW-29 (এল. নাটো সিংহ, সহকারী পরিচালক ও সিএফএসএল, কলকাতা)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোন এবং আপনার বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোন (IMEI নম্বর 864712051844301) পরীক্ষা করেছেন এবং উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোন থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার করেছেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোন এবং আপনার বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোনের মধ্যে সংযোগ এবং পেয়ারিং পাওয়া গেছে। সাক্ষ্য অনুযায়ী, পরীক্ষার সময় আপনার বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোনের সঙ্গে শুধুমাত্র একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন পেয়ার ছিল এবং উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি ছিল একমাত্র ধারাবাহিকভাবে পেয়ার করা ডিভাইস। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: উক্ত প্রতিবেদন সঠিক নয়।

প্রশ্ন ৪৭: সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, যখন আপনি আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি ভবনের তৃতীয় তলায় চেস্ট বিভাগের সিসিটিভি কভারেজে প্রবেশ করেন, তখন আপনার গলায় একটি ইয়ারফোন দেখা গিয়েছিল। তবে, সিসিটিভি ফুটেজে আপনার প্রস্থান করার সময় কোনো ইয়ারফোন আপনার সঙ্গে দেখা যায়নি। সেমিনার রুমের ডায়াস থেকে বাজেয়াপ্ত ইয়ারফোনটি আপনার মোবাইল ফোনের সঙ্গে পেয়ারড অবস্থায় পাওয়া গেছে। আপনি এ বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: এটি সঠিক নয়।

প্রশ্ন ৪৮: PW-৩৯ (সনৎ কুমার সাহা, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, এমএফইউ, কলকাতা পুলিশ)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা জরুরি ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেমিনার রুম পরিদর্শন করেন এবং সেখানে ডায়াসে সবুজ রঙের বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা একটি মহিলার মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহের মুখে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মৃতদেহের চোখ ও ঠোঁটে রক্ত দেখা যায়। এছাড়া, তারা একটি চশমা দেখতে পান, কিন্তু সেই চশমার একটি কাচ অনুপস্থিত ছিল। মৃতদেহ সরানোর পর তারা গদি নিচে উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোনটি পেয়েছিলেন, যা পরে আপনার বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোনের সঙ্গে পেয়ারড অবস্থায় পাওয়া যায়। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন ৪৯: উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল এবং উক্ত ভিডিওতে (Mat Ext LXXVI) ইয়ারফোনের অবস্থান প্রদর্শিত হয়েছে। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: উক্ত ব্লুটুথ ইয়ারফোনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন ৫০: PW-১৫ (ডাঃ পলিন আরা পারভীন)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭.০৮.২০২৪ তারিখে CGO কমপ্লেক্সে সিবিআই অফিসে আপনার সম্মতির পর আপনার রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং উক্ত রক্ত ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। উক্ত ব্লাড স্যাম্পল অথেন্টিকেশন ফর্ম যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে [Exbt. P-51 (15)], যা আপনার স্বাক্ষর বহন করে। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: হ্যাঁ, এটি সত্য যে সিবিআই অফিসে আমার রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ৫১: PW-৩৯ (সনৎ কুমার সাহা)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে ফরেনসিক টিম অপরাধস্থল থেকে সামগ্রী সংগ্রহ করেন এবং মৃতদেহ সরানোর পর একটি চশমা দেখতে পান। তবে, উক্ত চশমার একটি কাচ অনুপস্থিত ছিল এবং সেই অনুপস্থিত কাচটি মৃতদেহের নিচে পাওয়া যায়। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন ৫২: PW-১২ (ডাঃ অন্তরা বর্মন)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৯.০৮.২০২৪ তারিখে পুলিশ উক্ত ঘটনার স্থানে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং সে সময় একটি চশমা (যার একটি কাচ অনুপস্থিত ছিল) বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি উক্ত চশমাকে Mat Exbt. XX(P-12) হিসাবে প্রমাণ করেন। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি কিছু বলতে পারি না।

প্রশ্ন ৫৩: PW-৪৭ (পি. পল রমেশ, ডেপুটি ডিরেক্টর, ফিজিক, সিএফএসএল, কলকাতা)-এর সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি উক্ত চশমা এবং সেই চশমা থেকে আলাদা হওয়া কাচ পরীক্ষা করেন এবং তিনি মত দেন যে, উক্ত কাচটি চশমার অংশ ছিল এবং এটি বল প্রয়োগের কারণে আলাদা হয়েছে। আপনি কী বলবেন?
উত্তর: আমি কিছু বলতে পারি না।

এর পরে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তরেই সঞ্জয় রাই বলেন, "আমি কিছু বলতে পারব না"। কীকরে মৃতার শরীরে সঞ্জয় রাইয়ের ফরেনসিক প্রমাণ পাওয়া গেল, বা সঞ্জয়ের পোশাকে কীকরে মৃতার রক্ত এল, এই সমস্ত প্রশ্নও তার মধ্যে আছে। উনি এই সমস্ত জিনিসের কোনো ব্যাখ্য দেননি। একমাত্র শেষ প্রশ্ন যখন করা হয়, তখন একটা অন্য কথা বলেন। প্রশ্নটা ছিল, "আপনার আর কিছু বলার আছে?" সঞ্জয় উত্তরে বলেন, "আমি নির্দোষ এবং আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।"

এই পুরো বিবরণটাই মোটামুটি চার্জশিটেও ছিল। চার্জশিট অনুযায়ী, ৮ তারিখ, ঘটনার দিন সঞ্জয় রায়, আরেকজন সিভিক ভলান্টিয়ার সৌরভ ভট্টাচার্যর সঙ্গে ওই মোটর সাইকেলে চড়ে ব্যারাক থেকে বেরোন। উদ্দেশ্য ছিল সৌরভের তুতো-ভাই সাগর ভট্টাচার্যর চিকিৎসায় সাহায্য করা, যিনি আরজি করে ভর্তি ছিলেন। তারপর তাঁরা দুপুর ২ঃ৪৫ এ শোভাবাজারের এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে যান, অনুপ দত্তের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে। ব্যাংক বন্ধ ছিল। টাকা জমা দেওয়া যায়নি। তারপর তাঁরা মদ কেনেন এবং খান। সঞ্জয় আরজিকরে এবং সৌরভ ব্যারাকে ফিরে যান। সৌরভ আবার আরজি করে আসেন রাত ১০ঃ৪৫ নাগাদ, সঞ্জয়ের অনুরোধে। তারপর তাঁরা দুজনেই হাসপাতাল থেকে বেরোন, খাবার এবং মদ খান, চেতলার পতিতাপল্লীতে যান। সৌরভ এক যৌনকর্মীর ঘরে ঢোকেন। কিন্তু সঞ্জয় যৌনতায় লিপ্ত হননি, শুধু বিয়ার খান। দুজনেই ৩ঃ২০ (৯ তারিখ ভোর) নাগাদ আরজি করে পৌঁছন। সৌরভ ব্যারাকে ফিরে যান। সঞ্জয় জনৈক শুভ দের অপারেশনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে দোতলায় যান। কিন্তু তাঁর পরিবারের

কাউকে পাওয়া যায়নি। সঞ্জয় তখন ইমার্জেন্সি বিল্ডিং এর পাঁচ তলায় যান। তারপর ৪ তলায় পৌঁছন সকাল ৪ঃ০৩ এ, এবং সেমিনার রুমে ঢোকেন, যেখানে নির্যাতিতা একা ঘুমোচ্ছিলেন। ৪ তলা থেকে বেরিয়ে আসেন ৪ঃ৩২ এ। সেমিনার রুমের দিকে যাবার সময় সঞ্জয়ের গলায় একটা ব্লুটুথ নেকব্যান্ড ছিল। বেরোনোর সময় ছিলনা। বলা হয়, আরজিকরে ঢোকার আগে সঞ্জয়ের গতিবিধি দেখার জন্য কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হয়েছে। আরজি করের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজে সঞ্জয়ের উপস্থিতি চিহ্নিত করা গেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় চার্জশিটে। সঞ্জয়ের ব্লুটুথ নেকব্যান্ডের মতো একটি নেকব্যান্ড পুলিশ ক্রাইম সিনে উদ্ধার করে ওইদিন (৯ তারিখ)।

এছাড়াও সঞ্জয়ের মোবাইল ফোনের সিএএফ এবং সিডিআর সংগ্রহ করা হয়। চার্জশিটে বলা হয়, বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে, হাসপাতালে উপস্থিতির তথ্য তার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। অভিযুক্তর মোবাইল এবং ঘটনাস্থলের ব্লু টুথ মিলিয়ে দেখা হয়, পেয়ারিং হয়েছে। এছাড়াও চার্জশিটের বাকি ফরেনসিক প্রমাণ তো আগেই বলা হয়েছে। অভিযুক্তর মূত্রনালীতে বীর্য আছে - সেটা অভিযুক্তের। স্তনবৃন্তে লালা আছে - সেটা অভিযুক্তর। ক্রাইম সিন থেকে পাওয়া চুল- অভিযুক্তর। এগুলোর কোনো ব্যাখ্যাই সঞ্জয় রাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে চার্জশিটের টাইমলাইনের সঙ্গে সঞ্জয়ের আদালতের বয়ানের কোনো অমিল নেই। ফলে পতিতাপল্লী গমন, সেমিনার রুমে প্রবেশ, আধ ঘন্টা অবস্থান, ব্লুটুথ গায়েব হওয়া এবং প্রস্থান, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

২। আদালতের রায় ও তার কারণসমূহ - নির্বাচিত অংশ

এই অংশটি সাজানো পরপর অনেকগুলি সূত্রে, ১-১৯, এইগুলোই রায়ের ভিত্তি অর্থাৎ "কারণসমূহ", এরপরের অংশে আছে রায় ও রায়ের ব্যাখ্যা। সবকটি কারণ এই পরিসরে সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব হ'লো না, তবু কয়েকটি অংশ আলাদা করে উল্লেখের দাবী রাখে। সেগুলো ২.১-২.৫ অংশে আলোচিত হল। তার আগে নিচে দেওয়া রইলো মূল নথি থেকে প্রত্যেকটি উপবিভাগের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা। পড়ার সুবিধের জন্য।

১. কে এই সঞ্জয় রাই? (পৃঃ ১০৮)

২. সঞ্জয় রাইয়ের কর্মক্ষেত্র (প্লেস অফ পোস্টিং, পৃঃ ১০৯)
৩. নির্যাতিতার প্রোফাইল (পৃঃ ১০৯)
৪. নির্যাতিতার ডিউটির সময়কাল (ডিউটি আওয়ার্স, পৃঃ ১০৯)
৫. ৮ ও ৯-ই আগস্টের মধ্যে নির্যাতিতাকে শেষবার কবে এবং কোথায় জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল? (পৃঃ ১১০)
৬. কবে এবং কোথায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, কে তাকে পেয়েছিল এবং কে প্রথম আবিষ্কার করেন যে তিনি মৃত? (পৃঃ ১১৪)
৭. মৃত্যুর কারণ (পৃঃ ১১৮)
৮. মৃত্যুর সময়কাল (পৃঃ ১২৩)
৯. যৌন নির্যাতনের কোনও প্রমাণ ছিল কি না? (পৃঃ ১২৫)
১০. অপরাধী একজন না একাধিক (পৃঃ ১২৮)
১১. কে সেই ব্যক্তি যে এই নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল? (পৃঃ ১২৯) - এটিই দীর্ঘতম অংশ।
১২. ঘটনার স্থান/অপরাধস্থল (পৃঃ ১৪৬)
১৩. অভিযুক্তের মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন (পৃঃ ১৪৯)
১৪. পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য (পৃঃ ১৪৯)
১৫. পরোক্ষ প্রমাণসমূহ (Proof of circumstantial evidence, পৃঃ ১৫৫)
১৬. ঘটনাসূত্র (দ্য চেইন) (পৃঃ ১৫৭)
১৭. অভিযুক্তের উদ্দেশ্য (মোটিভ, পৃঃ ১৫৭)
১৮. ঘটনার আরেকটি দিক (পৃঃ ১৫৮)
১৯. অভিযোগকারীর লিখিত নোটে উত্থাপিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা (পৃঃ ১৫৯)। সেমিনার রুমের কাছেই অন্য একটি ঘর ধ্বংস করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ সম্বন্ধে এইখানে আলোচনা আছে।

এই উনিশটি বিভাগের পরেই আদালতের পর্যবেক্ষণ ও দণ্ডাদেশ। নথিটি অবশ্য এখানেই শেষ নয়। ১৬২-১৭২ পাতায় আছে ২০শে জানুয়ারির অর্ডার - যাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যথাযথ শাস্তি কি না, সেই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। তাতে উঠে এসেছে ১৯৮০ সালের বচ্চন সিং বনাম স্টেট অফ পাঞ্জাব, সহ আরও কয়েকটি অতীতের মামলা। উল্লেখ্য যে, এই বচ্চন সিং মামলাই ভারতে মৃত্যুদণ্ডের জন্য নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করেছিল - "রেয়ারেস্ট অফ রেয়ার" বা "বিরলের মধ্যে বিরলতম" নীতির প্রবর্তন এই মামলার সূত্রেই, যা বলে যে মৃত্যুদণ্ড শুধুমাত্র

সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আরোপ করা উচিত।

২.১। তিলোত্তমার সংস্পর্শে আর কে ছিলেন?

বলা বাহুল্য, তিলোত্তমা, ওই সময় সেমিনার রুমেই ছিলেন। ডাঃ সৌমিত্র রায়, ডাঃ অর্ক সেন, ডাঃ শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র, ডাঃ গোলাম আজম এবং তিলোত্তমা, পাঁচজনে নৈশাহার করেন ১২ঃ৪৫ বা ১ঃ০০ পর্যন্ত (তখন ৯ তারিখ হয়ে গেছে)। বাকিরা এরপর ঘর ছেড়ে চলে যান। এঁদের মধ্যে একজন, ডাঃ অর্ক সেন ২ঃ১৫ নাগাদ ওই ঘরে এসেছিলেন নিজের ব্যাগ খুঁজতে। ডাঃ আজম রাত ২ঃ৫০ এ সেমিনার রুমে এসেছিলেন, ডাঃ অর্ক সেনকে খুঁজতে। খুঁজে পাননি, দেখেন, তিলোত্তমা ঘুমোচ্ছেন। তারপর চলে যান। আদালতের রায়ে নেই, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে একটা ধুয়ো তোলার চেষ্টা হয়েছিল, এই জুনিয়ার ডাক্তারদের কেন গ্রেপ্তার করা হলনা। কজন ডাক্তারের নাম দিয়ে হোয়াটস্যাপে প্রচারও হয়েছিল একটা সময়। আদালতের রায়ে সেই প্রসঙ্গগুলো না থাকলেও খুব সুস্পষ্ট করে উত্তরটা দেওয়া আছে এই প্রসঙ্গে। রায় বলছে, "উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি হেফাজতে নেওয়া হয়, তবে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়। এছাড়াও, এটা উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন, যে, কোনো তদন্তকারী সংস্থা কোনো ব্যক্তির বয়ান পরীক্ষার সময় কোনো বিরোধ বা অসঙ্গতি খুঁজে পেলে তবেই তাকে হেফাজতে নেওয়া যেতে পারে। এখানে, এই মামলায়, উক্ত ডাক্তারদের সিবিআই সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং তাদের বক্তব্য যথাযথভাবে ধারা ১৮০ BNSS-এর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে। ওই বক্তব্যের অনুলিপি অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারের জেরা চলাকালে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি, যা থেকে বোঝা যায় যে ওই ডাক্তাররা, যারা উক্ত ভিকটিমের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছিলেন, কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ করেছেন।" (পৃঃ ১১২-১১৩) অর্থাৎ সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে, কোনো অসঙ্গতি, স্ববিরোধ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এঁদেরকে আদালতে জেরাও করা হয়েছে, তাতেও পাওয়া যায়নি। সমস্ত বয়ানটাই নিশ্চয়ই সিসিটিভির সঙ্গে মিলিয়েও নেওয়া হয়েছে। আদালত সব মিলিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, যে, ২ঃ৫০ এ তিলোত্তমা জীবিতই ছিলেন।

রায় অনুযায়ী, এবং চার্জশিট অনুযায়ীও, তিলোত্তমার দেহ আবিষ্কার হয় পরদিন সকাল নটা বা তার একটু পরে। ডাঃ সৌমিত্র রায় ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে, এসে মৃতদেহ দেখেন। চার্জশিট অনুযায়ী, ডাঃ সৌমিত্র রায় ডিউটিতে

দেখতে না পেয়ে নির্যাতিতাকে খুঁজতে সেমিনার হলে যান। ঢুকে দেখেন নির্যাতিতা খুবই অদ্ভুতভাবে নগ্ন পায়ে গদির উপর শুয়ে। বেরিয়ে এসে তিনি ডাঃ অর্ক সেনকে জানান। দেহ দেখে আরও কিছু মহিলা পিজিটি, ডাঃ প্রিয়া, ডাঃ ভেনিলা, যাঁরা সেসময় ছিলেন, তাঁদের জানানো হয়, কী হয়েছে দেখার জন্য। দেখে, এই দুজন ডাঃ সুমিত রায় তপাদারকে জানান। তিনি ছুটে আসেন এবং দেখেন নির্যাতিত মারা গেছেন, কারণ চোখ আধখানা খোলা ছিল, ডায়ালেটেড এবং স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাঁর নির্দেশে ডাঃ পূজা বেডশিট দিয়ে শরীর ঢেকে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রিন্সিপাল সহ কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশকে জানান। আউটপোস্টের এএসআই বাসুদেব কুন্ডু ক্রাইম সিনে আসেন। টালা থানাকে জানান। তারপর টালা থানার অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। চার্জশিট এবং রায়ের বর্ণনা মোটামুটিভাবে এক। এঁদের প্রায় প্রত্যেকে আদালতে হাজির ছিলেন, জেরার সামনে পড়েছেন। আদালত কোনো অসঙ্গতি পাননি। এমনকি অভিযুক্তের আইনজীবীও পাননি। তিনি কেবলমাত্র একটা পয়েন্ট তোলেন, যে, চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে, বা মৃত কিনা পরীক্ষা করে প্রমাণ লোপাট হয়েছে। আদালত, সহজবোধ্যভাবেই এই পয়েন্ট মেনে নেননি। সামনে একটা দেহ শায়িত থাকলে, ডাক্তাররা বেঁচে আছে কিনা দেখবেন, এতে অবাক হবার কিছু তো নেইই, বরং না হলেই আশ্চর্য হতে হত।

২.২। অপরাধী একজন না একাধিক?

মৃত্যুর কারণ যে শ্বাসরোধ এই নিয়ে কোনো সন্দেহই আসেনি। বস্তুত ময়নাতদন্ত এবং ফরেনসিক সাক্ষ্যের যাথার্থ্য নিয়ে গণমাধ্যমে যা ছড়ানো হয়েছিল, আগেই বলা হয়েছে, তার মধ্যে "সূত্র" কথাটা বলা থাকলেও, বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ উল্টো কথাই বলেছেন। নানা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একাধিকবার দেখিয়ে একাধিকবার যাচাই করে নেওয়া হয়েছে বিষয়টা। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা সাক্ষ্যও দিয়েছেন। ফলে প্রসঙ্গটাই ওঠেনি রায়ে। ধর্ষণ প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদানকারী বিশেষজ্ঞ বলেন, যোনিপথে ভোঁতা, শক্ত, কিন্তু মসৃণ কিছু প্রবেশ করানো হয়েছিল জোর করে। সেটা লিঙ্গ নাও হতে পারে। মৃতার শরীরে বীর্য যে পাওয়া যায়নি, রায় অনুযায়ী, তার সম্ভাব্য কারণ সেটাই।

এই পুরো কাজটা কি একজনেরই, না একাধিক জন জড়িত? এই প্রশ্ন ওঠে আদালতেও। রায়ে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট করা হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতামত দিয়েঃ "PW-21 এর মতে, মুখ, নাক এবং গলার উপর আত্মরক্ষামূলক আঘাত পাওয়া

গিয়েছিল এবং ওই আঘাতগুলি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। PW-21 আরও মতামত দিয়েছিলেন যে, বেশিরভাগ বাহ্যিক আঘাত সাধারণ প্রকৃতির ছিল। স্থিরচিত্র [Ext-P-125(21)] দেখিয়ে PW-21 বলেছেন যে, এটি প্রমাণ করে যে ওই আঘাত ডান হাতের বুড়ো আঙুলের চাপে সৃষ্টি হয়েছিল, যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান ছিল না এবং শুধুমাত্র বিচ্ছেদ করলে রক্তপাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা ব্রুইজ বা কনটুশন-এর সমার্থক।

Ext-P-130(21) দেখিয়ে PW-21 ব্যাখ্যা করেন যে, ওই চিত্রে একাধিক আঙুলের নখের চিহ্ন দেখা যায় এবং এটি তখনই সম্ভব, যখন কেউ ডান হাত ব্যবহার করে শ্বাসরোধ করে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে, PW-21 মতামত দিয়েছিলেন যে, ভিকটিমের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় একমাত্র একজন ব্যক্তি জড়িত ছিল।

...

MIMB এবং বিশেষত PW-37, PW-21-এর মতামত সমর্থন করেছেন এবং বোর্ডও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ঘটনাটি একজন ব্যক্তির দ্বারাই ঘটানো হয়েছে।"

তথ্যের জন্য বলে দেওয়া উচিত, PW-37 হলেন দিল্লি এমসের ডাঃ আদর্শ কুমার, এবং PW-21 হলেন আরজিকরের অপূর্ব বিশ্বাস। দুজনেই মতামত, সাক্ষ্য দেন, এবং জেরার সামনে পড়েন। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের বোর্ডের লিখিত মতামত তো ছিলই।

এতদ্বারা আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, যে, আততায়ী একজনই।

২.৩। একজন অপরাধী তাহলে কে?

সঞ্জয় রাই ঘটনাস্থলে আধঘন্টা ধরে উপস্থিত ছিলেন, এই নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। সিসিটিভি ফুটেজের সত্যতা এবং নিজের উপস্থিতি, সঞ্জয় নিজেও অস্বীকার করেননি। এছাড়া ফরেনসিক সাক্ষ্য, ডিএনএর উপস্থিতি, ব্লুটুথের উপস্থিতি, সবই দেখায়, মৃতার শরীরের সঙ্গে সঞ্জয়ের সংযোগ হয়েছিল। ফরেনসিক সাক্ষ্যের যাথার্থ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পরীক্ষার ফলাফল নিয়েই সামান্য একটা সন্দেহ ছিল, ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে, যেটা এর আগেই সংবাদপত্রে ফাঁস হয়েছিল। রায়েই বলা আছে, অনেকগুলি ফরেনসিক নমুনার মধ্যে কয়েকটিতে, যেমন,

নিপল সোয়াব, পরীক্ষা করে সঞ্জয় রাইয়ের ডিএনএ পাওয়া যায়। সঙ্গে অত্যন্ত অল্প পরিমানে কোনো এক মহিলার ডিএনএও পাওয়া যায়। রায় এই ব্যাপারে বলেছেঃ "পোস্টমর্টেম ভিডিওতে দেখা গেছে যে অন্যান্য মহিলা মৃতদেহও মেঝেতে পড়ে ছিল এবং এটা স্পষ্ট যে যে ট্রেতে এই ভিকটিমের পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল, সেটি পরীক্ষা করার আগে জীবাণুমুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট সহকারী (ডোম) স্যাম্পল বা ভলভার মপ নেওয়ার আগে গ্লাভস বা পোশাক/অ্যাপ্রন পরিবর্তন করেননি। ওই ভিডিও থেকে আরও পরিষ্কার যে পোস্টমর্টেমে ব্যবহৃত ছুরি/কাঁচিগুলি জীবাণুমুক্ত করা হয়নি।
এটি প্রমাণ করে যে পোস্টমর্টেম সেন্টারে মডেল পরিকাঠামোর অভাবে সঠিক প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়নি, এবং আদর্শ পোস্টমর্টেম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ছিল না। পোস্টমর্টেমে নিযুক্ত ডাক্তারদের এমন দুর্বল পরিকাঠামোর মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ওই ভিডিও দেখায় যে পোস্টমর্টেম কক্ষে সংক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, এবং এই সংক্রমণের জন্য পোস্টমর্টেম পরিচালনাকারী ডাক্তারদের দোষ দেওয়া উচিত নয়।
নিপল স্যাম্পলের ডিএনএ বিশ্লেষণ রিপোর্টে দেখা যায় যে এতে অভিযুক্ত এবং ভিকটিমের পূর্ণ ডিএনএ প্রোফাইল রয়েছে এবং অপর এক নারীর অতি সামান্য প্রোফাইল রয়েছে। নিপল স্যাম্পলে অভিযুক্তের পূর্ণ ডিএনএ প্রোফাইল উপস্থিতি প্রমাণ করে যে অভিযুক্ত ভিকটিমের দেহের সংস্পর্শে ছিলেন।"

"অতি সামান্য" কনটামিনেশনের এটাই ব্যাখ্যা। কেন একজনই অপরাধী, কেন সেই অপরাধী সঞ্জয়ই, আদালত পুরোটাই তার রায়ে ব্যাখ্যা করেছে। রায়টি অবশ্যই এর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু মোদ্দা বিষয় এইটুকুই।

২.৪। তিলোত্তমার সহপাঠী ও অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে আনা যে অভিযোগগুলি আদালত গ্রাহ্য করেননি।

এই অংশটির প্রায় পুরোটাই পৃঃ ১১১-১১৮ থেকে নেওয়া। এই অংশটি বিশদে দেখার দুটো কারণ। প্রথমত, সেই দিনের ঘটনাক্রম প্রতিষ্ঠা করা। আদালতের মতে, সমস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে যা জানা যায় তা মোটামুটি এই যে, প্রথমে ডাঃ গোলাম আজম (পি.ডব্লিউ-৪) মৃতদেহটি দেখেন, এরপর ডাঃ অর্ক সেন (পি.ডব্লিউ-৫), ডা. গিরি এবং ডা. ভেনিলা দেখেন এবং ডাঃ সুমিত রায় তফাদার (পি.ডব্লিউ-৬)-ই প্রথম সিদ্ধান্তে আসেন যে ভুক্তভোগী যৌন নির্যাতন এবং হত্যার

শিকার হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, অভিযোগকারীর পক্ষের আইনজীবীর বিভিন্ন অভিযোগ পরপর সাজালে একটা আবছা ছবি ফুটে ওঠে যে ওঁদের আক্রমণের নিশানায় ছিলেন তিলোত্তমার সহপাঠী, সহকর্মী ও শিক্ষক/অধ্যাপক-রাই, মূলতঃ, ডাক্তার (অর্ক সেন, গোলাম আজম), ওঁর-ই রুমমেট পূজা রাই, এবং হেড-অফ-ডিপার্টমেন্ট সুমিত রায় তফাদার, এবং আরও দুই সহকর্মী ডাঃ গিরি ও ডাঃ ভেনিলা। এদের সাক্ষী হিসেবে ক্রমাঙ্ক - গোলাম আজম (৩), অর্ক সেন (৪), পূজা রাই (৫), এবং সুমিত রায় তফাদার (৬)। এদের বিরুদ্ধে আনা বিভিন্ন অভিযোগ, এবং সেগুলি গ্রাহ্য না করার কারণ পরপর দেওয়া হ'ল নিচে।

- (পৃঃ ১১১-১১২) অভিযোগকারীর এবং অভিযুক্তের পক্ষের আইনজীবী অভিযোগ করেন যে, উল্লিখিত চিকিৎসকরা একসাথে ডিনার করেছিলেন এবং খাবার একটি ফুড ডেলিভারি অ্যাপ্লিকেশন থেকে অর্ডার করা হয়েছিল, তবুও কোনো ফুড ডেলিভারি কর্মীকে পরীক্ষা করা হয়নি বা সেই খাবারের কন্টেইনারগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। তাদের মতে, এটি তদন্ত প্রক্রিয়ার একটি বড় ত্রুটি ছিল। যেহেতু মৃত্যুর কারণ বিষক্রিয়া নয়, বরং শ্বাসরোধ এবং ধর্ষণ - আদালত এই অভিযোগ গ্রাহ্য করেননি। আগেই লেখা হয়েছে, যে, শুধু ডেলিভারি কর্মীই নয়, অভিযোগকারীর আইনজীবী দাবি করেন যে, সত্য উদঘাটনের জন্য সিবিআইএর উচিত ছিল যারা একসাথে ডিনার করেছিলেন (অর্থাৎ তিলোত্তমার সঙ্গে যে চারজন ডাক্তার ছিলেন), তাদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা।
  বিচারক দাস এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যে উনি আইনজীবীর কাছে এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাশা করেননি। বিচারক দাসের মতে, ঐ চিকিৎসকরা কল্পনাও করেননি যে ডিনারটি ভুক্তভোগীর "লাস্ট সাপার" হবে, এবং সমস্ত প্রমাণাদি বিচার করে তিনি এমন কিছুই খুঁজে পাননি যা দ্বারা ওই চিকিৎসকদের জড়িত থাকা প্রমাণিত হতে পারে।

- (পৃঃ ১১২-১১৩) পি.ডব্লিউ-৩, গুলাম আজমের সাক্ষ্য অনুযায়ী ঘটনার দিন, অর্থাৎ ৯-ই আগস্ট, ২:৫০-এ তিনি চেস্ট ডিপার্টমেন্টের ৩য় তলার আর.সি.ইউ রুমে একজন রোগীর ABG টেস্ট করতে যান। এরপর তিনি পি.ডব্লিউ-৪, অর্ক সেনকে খুঁজতে সেমিনার রুমে যান কিন্তু সেখানে তাঁকে না পেয়ে স্লিপ স্টাডি রুমে গিয়ে তাকে পান। ডাঃ আজম বলেন, সেমিনার রুমে ঢোকার সময় দরজা থেকে তিনি দেখেন ভুক্তভোগী একটি ম্যাট্রেসে

ডায়াসের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর আইনজীবীরা যুক্তি দেন যে ফটোগ্রাফ নং ৩০ (Ext-P-47(14)) দেখে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলা যায় যে, সেমিনার রুমের প্রবেশদ্বার থেকে তাকালে ডায়াসের উপর কাউকে দেখার সম্ভাবনা নেই। আদালত এই যুক্তিটিও বিবেচনা করে খারিজ করে দেন কারণ আসামী পক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এই বিষয়ে ঐ দুজনকে কোনও প্রশ্ন করেনি। তেমনি সেমিনার রুমের দরজা এবং ডায়াসের দূরত্ব সম্পর্কেও অন্য সাক্ষীদের (পি.ডব্লিউ-১৯, পি.ডব্লিউ-৪৯–৫০)-কে প্রশ্ন করা হয়নি, আর ডাঃ আজমকেও জিজ্ঞাসা করা হয়নি সেইদিন উনি সেমিনার রুমের ঠিক কতোটা ভেতরে প্রবেশ করে নির্যাতিতাকে ডায়াসে শায়িত অবস্থায় দেখতে পান। অতএব, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের অনুপস্থিতিতে এই অভিযোগ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

- (পৃঃ ১১৩) এর ঠিক পরেই, অভিযোগকারীর আইনজীবী অভিযোগ করেন যে, আগস্ট মাসের গরমে তিলোত্তমা কেন লাল রঙের কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তা প্রসিকিউশন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ফলে, ডাঃ অর্ক সেন (পি.ডব্লিউ-৪)-এর সাক্ষ্যের উপর গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভুক্তভোগীকে লাল কম্বল দিয়ে ঢেকে ঘুমাতে দেখেছেন। আদালত এর উত্তরেও আইনজীবীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেন যে, এত গুরুতর মামলায় এ ধরনের যুক্তি মোটেও প্রত্যাশিত নয়। পি.ডব্লিউ-৩, ৪, ১৯ (গুলাম আজম, অর্ক সেন, বিকাশ মাজী) বা পি.ডব্লিউ-৪৯ এবং ৫০ (তদন্তকারী অফিসার)-কে কখনো জিজ্ঞাসাই করা হয়নি যে, ঐ সেমিনার রুমে ফ্যান বা এয়ার কন্ডিশনার ছিল কিনা। এর পরেই বলা হয়, যে ছবি থেকে পরিষ্কার ঐ ঘরে ফ্যান-ও ছিল, এয়ার-কণ্ডিশন-ও।

- (পৃঃ ১১৫) চতুর্থ সাক্ষী, পি-ডাব্লিউ-ফোর, ডাঃ অর্ক সেনের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ এনেছিল আসামিপক্ষ এবং অভিযোগকারীর আইনজীবী দুইয়েই। দুই দলের-ই বক্তব্য যে অর্ক সেন জানতেন ভুক্তভোগী আর জীবিত নেই, এবং সেজন্যেই তিনি একা সেমিনার রুমে গিয়েছিলেন। বিচারক এটিকেও উড়িয়ে দিয়ে বলেন তাঁর মতে, এটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং ভিত্তিহীন। সাক্ষ্যের

(ক্রস-এক্সামিনেশনের) সময়েও সাক্ষী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে শত্রুতা প্রমাণ করার মতো কোনও প্রশ্নও তোলা হয়নি। তাই অভিযোগকারীর এই দাবি যে এই সাক্ষী অস্বাভাবিক মৃত্যুর সাথে জড়িত ছিলেন এবং তার সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করা উচিত, সেটি ভিত্তিহীন। বিচারক দাস জোর দিয়েই বলেন যে, তার মতে সাক্ষ্য খুবই স্বাভাবিক ছিল, এবং মৌখিক সাক্ষ্যকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছেন উনি। এখানে লক্ষণীয় যে বিচারক দাসের তিরস্কারের ভাষায় অভিযোগকারীর আইনজীবীর দাবিকে "যুক্তি" না বলে বলা হয়েছে "স্লোগান", লিখেছেন, "and as such I do not find any ground why the complainant raised the *slogan* that this witness had nexus with such unnatural death of the victim." (স্লোগান শব্দটি রায়ের নথিতেই ইটালিসাইজড।)

- (পৃঃ ১১৬) অভিযোগকারীর আইনজীবীরা এর পর অভিযোগ করেন কেন তিলোত্তমার সহপাঠীরা হেড অফ ডিপার্টমেন্টকে ফোন না করে ওঁর অফিসে দৌড়ে যান, এবং তাঁরা জানলেন-ই বা কী করে যে উনি ঐ সময়ে নিজের অফিসেই থাকবেন? এটিও আদালত উড়িয়ে দেন, কারণ স্পষ্টতঃই হেডের চেম্বার ঐ সেমিনার রুমের উল্টোদিকেই। সেখানে ফোন না করে ছুটে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিচারক দাস এও বলেন, যে সেই সময়ে তিলোত্তমার সহপাঠীদের কাছে এই ঘটনা একটি মারাত্মক আঘাত, কিন্তু তবুও তাদের আচরণে কোনোরকমের অসঙ্গতি তিনি দেখেন নি।

- (পৃঃ ১১৭) এর পরের অভিযোগ - ষষ্ঠ সাক্ষী (পি-ডাব্লিউ-৬) সুমিত রায় তফাদার হাসপাতালের বিছানার চাদর দিয়ে নির্যাতিতার দেহ ঢাকতে নির্দেশ দিয়ে সঠিক প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ নষ্ট করেছেন এবং তাই তিনি-ও প্রমাণ লোপাটের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। বলাই বাহুল্য, বিচারক এটিও উড়িয়ে দিয়ে বলেন যে পি.ডব্লিউ-৬-এর এই কাজ মৃতদেহের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ছিল, এবং এটা ভাবা কষ্টকর যে একটা চাদর দিয়ে মৃতদেহ ঢাকার জন্য প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে।

এখানে আরেকটা অংশ উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেইদিন যা ঘটেছিল তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তিলোত্তমার সহপাঠীদের উপর?

ডাঃ সুমিত রায় তপাদারের জবানবন্দী অনুসারে, নয়ই আগস্ট তিনি সকাল ৯:৩০-এ ডিউটিতে যোগদান করেন এবং এইচওডি-র চেম্বারে যান। যখন তিনি একা ছিলেন, তখন প্রথম বর্ষের দুই পিজিটি, ডা. প্রিয়া গিরি এবং ডা. ভেনিলা, চেম্বারে আসেন। ডাঃ সুমিতের বয়ানে, ওঁরা দুজনেই কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন, একটি কথাও শেষ করতে পারেননি, কেবল বারংবার তিলোত্তমার নাম বলে ওঁকে সেমিনার রুমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর তিনি ডা. প্রিয়া গিরি এবং ডা. ভেনিলার সাথে দ্রুত সেমিনার রুমে যান। গিয়ে কী দেখেন সেই বর্ণনা আগেই দেওয়া তাই পুনরুক্তি করা হ'লো না।

২.৫। অভিযোগকারীর লিখিত নোটে উত্থাপিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা

রায়ের ১৫৯-১৬০ পাতায় অভিযোগকারী অর্থাৎ তিলোত্তমার পক্ষের কয়েকটি লিখিত অভিযোগের উত্তর গুছিয়ে লেখা। নিচে বিচারক দাসের বক্তব্যগুলিই পরপর দেওয়া হ'ল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এইগুলো শুধু অভিযোগকারী পক্ষের উত্তর-ই নয়, সমাজমাধ্যম ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি গুজবের-ও উত্তর।

ক) "সেমিনার রুমের পাশের ঘর ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট হয়েছে"—এই অভিযোগ উঠেছিল। বিচারপতি দাস জানান যে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনর পর আদালতের পর্যবেক্ষণ এই যে CFSL দল সেই ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করেছিল, কিন্তু কোনো জৈব প্রমাণ পায়নি। তাই এই অভিযোগের তেমন কোনো ভিত্তি নেই।

খ) আরেকটা প্রশ্ন ছিল, প্রিন্সিপাল কেন মৃত্যুর কারণ খুঁজতে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। বিচারপতি দাসের মতে, যেহেতু ঘটনাটা কাজের সময় ঘটেছে, তাই এই পদক্ষেপ ভুল নয়। তবে তদন্তকারী সংস্থাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে ওই কমিটির রিপোর্ট শেষ পর্যন্ত কী হলো। এও অভিযোগ উঠেছিল, প্রিন্সিপাল কেন কোনো ফর্ম্যাল অভিযোগ দায়ের করেননি। বিচারপতির মতে, এর উত্তর রায়ের নির্দিষ্ট অংশে দেওয়া হয়েছে।

গ) তিলোত্তমার বাবা অভিযোগ করেন যে, ঘটনার প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। বিচারপতি দাসের মতে, তদন্তে দেখা গেছে, প্রসিকিউশন বেশ কিছু স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছে যা থেকে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে (এর পরের অংশ

দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ধারা ২৩৮ অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কিছু নেই। কারণ, দায়িত্বে অবহেলা ("dereliction of duty") আর প্রমাণ নষ্ট ("tampering of evidence") করা এক জিনিস নয়। তাই ৩৫৮ BNSS ধারা অনুযায়ী অন্য কাউকে দোষী ধরার কারণ দেখছি না।
(প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ধারা ৩৫৮ অনুযায়ী, আদালত তদন্ত বা বিচার চলাকালে যদি দেখতে পায় যে অভিযুক্ত ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি অপরাধ করেছে, তবে আদালত সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকেন, তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার বা সমন জারি করা যেতে পারে। আর ধারা ২৩৮ "অপরাধের প্রমাণ গায়েব করা বা অপরাধীকে আড়াল করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান"। ২৩৮ অনুযায়ী যে কেউ, জেনে বা কারণবশত বিশ্বাস করে যে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এবং সেই অপরাধের প্রমাণ মুছে ফেলে বা অপরাধীকে আইনগত শাস্তি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কাজ করে অথবা সেই উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। উদাহরণ, A জানে যে B -কে হত্যা করেছে। A ইচ্ছাকৃতভাবে B-কে আড়াল করার জন্য লাশ গোপন করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে, A সাত বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার শাস্তিযোগ্য।

ঘ) এ ছাড়াও কয়েকটি অভিযোগ উঠেছিল, যেমন, প্রিন্সিপাল নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেম্বার থেকে বের হননি, তাই তিনি দোষী। কিন্তু এটা PW-2 (ভুক্তভোগীর বাবা)-এর সাক্ষ্যের সাথে মেলে না। ওই সাক্ষী বলেছেন, প্রিন্সিপালের চেম্বারে যেতে বলা হলেও অভিভাবকরা যেতে চাননি, বরং তাদের দাবি ছিল প্রিন্সিপালকেই বেরিয়ে আসতে হবে। এটা কোনোভাবেই প্রিন্সিপালকে দোষী প্রমাণ করে না। এ ছাড়াও, প্রিন্সিপালের পদত্যাগ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কিন্তু বিচারকের মতে এটা পুরোপুরি প্রশাসনিক বিষয়, মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়, তাই এটাকে যুক্তি হিসেবে ধরা ঠিক হবে না।

ঙ) ধারা ১১৯ BSA নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। (নোট: ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (BSA) এর ধারা ১১৯ অনুযায়ী, আদালত প্রাকৃতিক ঘটনা, মানব আচরণ এবং সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ভিত্তিতে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চুরি হওয়ার পরপরই যদি কেউ চুরি করা জিনিসসহ ধরা পড়ে এবং তার মালিকানার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারে, তাহলে আদালত অনুমান করতে পারে যে সে হয় চোর বা চুরি করা জিনিস জেনে

গ্রহণ করেছে। এছাড়া, আদালত অনুমান করতে পারে যে একজন সহযোগী অপরাধী বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদি না তার বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমর্থিত হয়। তবে, এই অনুমানগুলি প্রাথমিক এবং প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডনযোগ্য।)

চ) নার্সিং স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা প্রসঙ্গ রায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খাবার ডেলিভারি করা ব্যক্তি বা খাবারের পাত্র কেন বাজেয়াপ্ত করা হয়নি—এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল, যার জবাব আগেই দেওয়া হয়েছে। একজন বলেছিলেন, টেবিলটি বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু বিচারক দাস জানান যে তিনি এর কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখেন নি, তাই এ নিয়ে কিছু বলার নেই। তিনি এও বলেন যে, "আমি বুঝতে পারছি না, অভিযোগকারী পক্ষ কেন বলেছে যে, বাজেয়াপ্ত করার কাজ বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের (JM) করা উচিত ছিল। তারা এই অভিযোগটির-ও কোনো আইনি ভিত্তি দেখাতে পারেননি, তাই এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ।"

ছ) GD এন্ট্রিগুলোর বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছিল, বিচারকের মতে তিনি এর বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

জ) হাসপাতালের প্রিন্সিপালের মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়নি—এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে বিচারকের মতে, অতিরিক্ত তদন্ত এখনো শেষ হয়নি, তাই এই মুহূর্তে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

ঝ) সব শেষে, বিচারকের মন্তব্য, "আমার মনে হয়, অভিযোগকারীর আইনজীবী যথাযথভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলতে পারেননি। অনেক অনুমানভিত্তিক ও কল্পনাপ্রসূত প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যা তাদের যুক্তিকে দুর্বল করেছে। ("Some hypothetical and imaginary questions were placed which made their entire effort a very light one")। আমি সন্দেহ করছি, এই নথিটা আদৌ লিখিত যুক্তিতর্ক হিসেবে ধরা যায় কি না। আমার কাছে পরিষ্কার নয়, বিচারপর্বে "অতিরিক্ত তদন্ত" চাওয়া হলো কীভাবে এবং এই পর্যায়ে এর আইনি ভিত্তি কী?"

২.৬। বিচারকের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রতি অসন্তোষ

ক) এস আই সুব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন তিনি নয়ই অগাস্ট রাত সাড়ে এগারোটার

সময় ইউডি (UD case vide No. 861) রেজিস্টার করেন। তথ্যপ্রমাণ বলছে, তিনি সেদিন দুপুর তিনটের সময় ডিউটি জয়েন করেছিলেন। তারপর এস আই চিন্ময় বিশ্বাস তাকে ফোন করে ভিকটিমের ধর্ষণ-হত্যার খবর দেন। ফোন পেয়ে বিকেল চারটে চব্বিশ মিনিটে তিনি হাসপাতালে যান এবং FSL টিমকে স্যাম্পল কালেক্ট করতে দেখেন। তিনি সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেন, seizure list তৈরি করেন, তারপর স্যাম্পল লেভেল আর বন্ধ করার পর টালা থানার মালখানায় জমা দেন। এর পর থানায় ফেরত আসার পর দেখেন মৃতার বাবা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই Tala PS case No. 52 রাত এগারোটা পয়ঁতাল্লিশে রেজিস্টার করা হয়।এই FIR নম্বরটির রেফারেন্স জিডিতে (GD No. 577) উল্লিখিত হয়।

তথ্যপ্রমাণ এও বলছে মৃতার মৃত্যুর খবর দুপুর বারোটা পয়ঁতাল্লিশে জানানো হয় এবং টালা থানা সেই খবর পায় দুপুর দুটোয়। বিচারক খেয়াল করেন UD কেস নম্বরটি টালা থানার রেজিস্টারে (Tala PS vide No. 861) প্রথমে লেখা হয় নি। সুব্রতবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর দেবীপ্রসাদ দাসের থেকে নম্বরটি জেনে সেটি বাজেয়াপ্তকরণ তালিকায় নথিভুক্ত করেন। বিচারক এও উল্লেখ করেন যে তিনি এই বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি আর UD কেসটির কথা 576 নম্বর জিডিতে রাত সাড়ে এগারোটার পরে নথিভুক্ত করেন। দেখা যাচ্ছে সেদিন আরজিকরের এক ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আরো একটি জিডি (GD No. 542) নথিভুক্ত হয়েছিল, আর সেটি সুব্রতবাবু নিজের হাতে লেখেন। সেই জিডিটিতে লেখা হয় তিনি অপরাধস্থল থেকে সকাল দশটা দশে ফিরে আসেন, অথচ সেসময় তিনি থানায় ছিলেন না।

বিচারক জানান, সিনিয়র ইন্সপেক্টর পদের একজনের থেকে এরকম বেআইনি কাজ আশা করা খুব হতাশাজনক। এটা প্রমাণ করে পুলিশ সেদিন ঘটনাটিতে বিশেষ গুরুত্ব তো দেয়ই নি, এমন কি এই বেআইনি কাজের কথা কোর্টে বলার সময়ও সুব্রতবাবু লজ্জিত ছিলেন না।

সুব্রতবাবু দাবি করেন সকাল দশটা দশের সময়টি তাকে লিখতে বলা হয়েছিল।কিন্তু কে তাকে এই বেআইনি কাজটি করতে বলেন তা তিনি জানান নি। বিচারক জানতে চান কাজটি বেআইনি জেনেও কাজটি তিনি লিখলেন কেন, বা প্রতিবাদ করলেন না কেন! সে প্রশ্নেরও কোনও উত্তর ছিল না।

খ) তথ্যপ্রমাণ বলছে মৃতার বাবা সেদিন দুপুর বারোটা পয়ঁতাল্লিশে হাসপাতালে পৌঁছান। টালা থানা ডেথ সার্টিফিকেট পায় দুপুর দুটোয়। অথচ মৃতার বাবা মা

থানায় অভিযোগ করেন সন্ধ্যা ছটায়। বিচারক পুলিশের কাছে তাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার কারণ জানতে চান। ঠিক কী কারণে তাদের কেউ আগে অভিযোগ জানাতে বলেন নি, তার উত্তর পাওয়া যায় নি।

গ) অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অনুপ দত্ত অপরাধীকে প্রশ্রয় দিতেন। যে ক্ষমতা এবং সুবিধা তিনি ভোগ করতেন তা একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের পাওয়ার কথা নয়।

ঘ) ইন্সপেক্টর রূপালী মুখোপাধ্যায় আটই অগাস্ট অভিযুক্তের মোবাইল ফোনটি নিয়ে টালা থানায় অরক্ষিত ফেলে রাখেন। একজন সিনিয়র অফিসারের এই রকম অবিমৃষ্যকারীতায় বিচারক বিস্ময় প্রকাশ করেন। রূপালীদেবী বলেন আট তারিখ ফোনটি অভিযুক্তকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গ্রেপ্তারির সময় সেটি বাজেয়াপ্ত হয়। অথচ এই পুরো সময়টাতে অপরাধী কলকাতা পুলিশের অধীনেই ছিলেন। রূপালীদেবী অসৎ উদ্দেশ্যে কাজটি করেছেন, বা ফোন থেকে কোনও তথ্য মুছে দিয়েছেন তার কোনও প্রমাণ নেই। বিচারক জানান,এই গাফিলতি ডিফেন্স লইয়ার ব্যবহার করতে পারতেন।

ঙ) বিচারক কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে এই ধরনের গাফিলতি এবং বেআইনি কাজ বন্ধ করতে আরও কঠোর হবার নির্দেশ দেন।

চ) ঘটনাক্রম তৈরি করার সময় সিবিআইয়ের সীমা পাহুজা অতিরিক্ত কোনও অনুসন্ধানই করেন নি। তিনি শুধু প্রাপ্ত প্রমাণ খুঁটিয়ে দেখেছেন, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করেছেন, এবং কলকাতা পুলিশ আর সিবিআইএর পাওয়া প্রমাণ দিয়েই ক্রম সাজিয়েছেন। বিচারকের মনে হয়েছে টালা পুলিশ প্রথম থেকে আরও গুরুত্ব এবং সচেতনতার সাথে বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে কাজ করলে বিচারে এত সমস্যা তৈরি হত না।

ছ) ডাক্তার সুমিত কুমার তপাদারের বয়ান অনুসারে, নন-মেডিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট সুচরিতা মৃতার বাবাকে ফোন করে বলেন মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। সুমিতবাবু বলেন, তিনি এই কাজটির প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সুচরিতার কাছে এই কাজের জবাবদিহি চান।

জ) তথ্যপ্রমাণ বলছে সন্দীপ ঘোষ ঘটনাটি জানার পরেই সুমিতবাবুকে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার নির্দেশ দেন। যদিও পুলিশ তদন্তের আগে মৃতদেহ স্থানান্তর করতে সুমিতবাবু অস্বীকার করেন।

ঝ) সাব-ইন্সপেক্টর সৌরভ কুমার ঝা সকাল দশটা দশে আর্জিকর পুলিশ আউটপোস্ট থেকে ভিকটিম ডাক্তারের আত্মহত্যার খবর পান। সেই খবরের তিনি কোনও জিডি নথিবদ্ধ করেন নি। তবে জিডি লেখার জন্য জিডি বুকে খালি জায়গা রাখেন। সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত চট্টোপাধ্যায় সেই জায়গাটিতেই রাত এগারোটার সময় নিজে হাতে লিখে জিডি নথিবদ্ধ করেন এবং সময় উল্লেখ করেন সকাল দশটা দশ।

ঞ) তথ্যপ্রমাণ থেকে নিঃসংশয় ভাবে বলা যায় আত্মহত্যার খবরটি ইচ্ছাকৃত প্রচারিত করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার দায় এড়াতে পারেন না।

ট) জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ‘বেআইনি স্বপ্ন’ সফল হয় নি। তাদের স্মারকলিপি অধ্যক্ষের কাছে জমা পরার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এসব কারণে অনেকটা দেরি হয়ে যায় আর এই কারণেই মৃতার বাবা ম্যাকে মৃতদেহের কাছে যেতে দেওয়া হয় নি।

ঠ) সুমিতবাবুর বয়ান অনুসারে হাসপাতালের অধ্যক্ষ আর সহ-অধ্যক্ষ সুমিতবাবুর থেকে জেনেছিলেন যে কর্মরত অবস্থায় একজন চিকিৎসকের আস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তবু তারা নিজেরা সেটা থানায় ফোন করে অফিসিয়ালি জানান নি যা তাদের কর্তব্য ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আচরণ প্রমাণ করে তাদের কাজে গাফিলতি ছিল এবং তারা তথ্যগোপন করতে চেয়েছিলেন। অথচ, কলকাতা পুলিশ বা সিবিআই সে বিষয়ে কোনও তদন্ত করেনি।

ড) শিয়ালদা কোর্টের অনুমতি পাবার পরেও সিবিআই শুধুমাত্র ধর্ষণ এবং খুনের চার্জশিট দিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর টালা থানার গাফিলতি ছিল কিনা তার আনুসন্ধান এখনও চলছে।

ণ) সুমিতবাবুর বয়ান অনুসারে, ঘটনার কথা জানার পর সন্দীপ ঘোষ তাকে নিজের ঘরে সাক্ষাতের জন্য ডাকেন। সুমিতবাবু সেখানে পৌঁছে দেখেন ঘরটি বন্ধ রয়েছে

এবং চেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধানের ঘরে সন্দীপবাবু অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের আরও সাতজন প্রধানকে নিয়ে মিটিং করছেন। অথচ সিবিআই রিপোর্টে এসবের কোনও উল্লেখ নেই।বিচারক এই বিষয়গুলিকে ধূসর বলে আখ্যা দেন।

সূত্র:

১. https://theanalysis.org.in/rg-kar-case-judgment-full-verdict-of-the-sealdah-court-on-18-01-2025/ (আর্কাইভড লিঙ্ক - https://archive.is/EgXLZ)
২. LiveLaw coverage: https://www.livelaw.in/top-stories/rg-kar-rape-murder-case-live-updates-from-hearing-281436 (আর্কাইভড লিঙ্ক - https://archive.is/Znn71)

২.৭। অল্ট-নিউজে প্রকাশিত ফ্যাক্ট-চেক তালিকা (আর জি কর ঘটনা সম্পর্কিত)

এই ঘটনাপ্রবাহের একটি অস্বস্তিকর দিক - শুরুর দিন থেকে সামাজিক ও গণমাধ্যমে ভুয়ো খবরের বন্যাস্রোত। সেই স্রোত সরে গেলেও এই নির্মম সত্যটা থেকেই যায়, থেকেই যাবে, যে সরকারি একটা হাসপাতালে মর্মান্তিকভাবে খুব এবং ধর্ষণ হয়েছে এক ডাক্তারের। এর দায় অবশ্যই প্রশাসনের। গোড়ার দিকে চূড়ান্ত গাফিলতি দেখিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরিকাঠামো অবধি ঠিক নেই। এর প্রত্যেকটাই গুরুতর ব্যাপার। একটুও ফেক না। এর দায় রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের।
সত্যিই একটা অতি ন্যক্কারজনক, নৃশংস ঘটনা, যা সরকারি হাসপাতালে, প্রায় সরকারি রক্ষক গোত্রের ব্যক্তির দ্বারা ঘটানো, তাও কর্তব্যরত অবস্থায়, এটুকুই কি যথেষ্ট ছিল না, প্রচণ্ড প্রতিবাদের জন্য? এই প্রতিবেদন লেখার সময় আমাদের জানা নেই, সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে কী কী সুরক্ষাজনিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক আদৌ আছে কি না, কেন এরকম পদে চুক্তিকর্মীরা থাকছেন, সেই যে রাত্রিসাথী অ্যাপের কথা শোনা গেছিলো, তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।
অন্যদিকে ভুয়ো খবর আর ছত্রে ছত্রে মিথ্যাচার চলছে, চলবে। সম্পূর্ণ যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষজনকেও এই ভুয়ো খবর আর মিথ্যাচারের চক্করে কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিতে দেখলে অস্বস্তি লাগে। এবং আগামী দিনগুলিতে সেই অস্বস্তি বাড়বে।

এর দায় কার, সেই বিচারসভা বসানোর উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তবে এ কথা আমরা জানি যে, স্বৈরাচারী শাসনের একটা বিশেষ লক্ষণ সমস্ত সরকারি জনপ্রতিষ্ঠানকেই ঘোগের বাসা বানিয়ে তাদের একে একে নষ্ট করে ফেলা, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে শূন্য করে দেওয়া। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে পুরো ব্যবস্থাটাই এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ-ও আর ভরসা রাখতে পারে না যে পুলিশ বা প্রশাসন বা আইন-আদালতের উপর, বা কোনো সংবাদমাধ্যমের উপর। হ্যানা আরেন্ট লিখেছিলেন, “This constant lying is not aimed at making the people believe a lie, but at ensuring that no one believes anything anymore. And such a people, deprived of the power to think and judge.. such a people, you can do whatever you want.”

এই ঘটনার শুরুর দিকে অল্ট নিউজের একটি তথ্য যাচাইয়ের খবর শেয়ার করে প্রতীক সিনহা লিখেছিলেন, “একজনের প্রোফাইল থেকে একটা ছবি চুরি করে তাদের অপরাধী বলে দাবী করে একটা মিথ্যা গুজব বানিয়ে ছড়াতে লাগে এক মিনিটের-ও কম, আর সেইটা ভুল প্রমাণ করতে লেগে যায় একাধিক দিন, বা আরও বেশি।” সত্যিই তাই, এই বিশাল হোয়াটস-অ্যাপ আর ফেসবুকের মূহুর্তে ভাইরাল হওয়া মিথ্যাচারের সামনে হাতে-গোনা কয়েকটি তথ্য-যাচাইয়ের সংস্থা বালির বাঁধ বই কিছু তো নয়। আমাদের এই কাজটিও সেই বালির বাঁধের-ই একটি অংশ ।

নিচে অল্ট-নিউজ ওয়েবসাইটে আজ পর্যন্ত আর জি কর সম্পর্কিত যে যে ভুয়ো খবর উন্মোচন করা হয়েছে তার একটি তালিকা যুক্ত করা হ'ল। এই তথ্য-যাচাইগুলির সময়কাল ঘটনার ঠিক পরপর-ই মূলতঃ ১৮-২৪ আগস্ট। এর অনেকগুলিই পরবর্তীকালে সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত, ফরেন্সিক রিপোর্ট অথবা আদালতের রায়ে অথবা চার্জশিটে। উদাহরণ, রায়ের ৫১ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা, “The said witness also deposed that on examination of internal genitalia, the team had noticed white thick viscid liquid inside endocervical canal and the same was collected by swab.” এবং, “It was the specific version that the weight of internal genitalia, more precisely uterus and ovary, was noted as 151 gram.” অল্ট-নিউজের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় শুধু এই জন্যেই যে, যখন তারা এই ভুয়ো খবরগুলি যাচাই করে একের পর এক খবর প্রকাশ করছেন, কার্যত, গোটা মিডিয়া ও সমাজমাধ্যম ভেসে যাচ্ছে ভুয়ো খবরে। সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসের জন্য তাদের কাছে কুর্নিশ। তবুও, পাঠকদের অনুরোধ এই তালিকার লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করে যাচাই করে নেওয়ার।

১. মিথ্যা: "দেড়শো গ্রাম বীর্য।"
https://www.altnews.in/150-gram-semen-found-in-r-g-kar-victims-body-no-post-mortem-report-mentions-weight-of-genitalia/
("সুতরাং, যারা ভুক্তভোগীর পক্ষে এই দাবিটি করেছিলেন, তারা সম্ভবত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ভুলভাবে পড়েছিলেন এবং তারপর এই গুজবটি সামাজিক মাধ্যমে আরও ছড়িয়ে পড়ে, যা গণধর্ষণের তত্ত্ব তৈরি করে। ...তবে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভুক্তভোগীর দেহে ১৫০ গ্রাম বীর্য পাওয়া গেছে এমন দাবি মিথ্যা।")

২. মিথ্যা: "নির্যাতিতার পেলভিক গার্ডল ভাঙা।"
https://www.altnews.in/pelvic-girdle-hyoid-bone-broken-r-g-kar-victims-post-mortem-report-says-no-fracture-found/
("সংক্ষেপে, মৃত চিকিৎসকের পেলভিক গার্ডেল, কলারবোন এবং হাইয়েড হাড় ভেঙে যাওয়ার যে দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দ্বারা সমর্থিত নয়। রিপোর্টে কোনো ভাঙা হাড়ের উল্লেখ নেই।")

৩. মিথ্যা: "ডাক্তার গোলাম আজম ঘটনার সাথে জড়িত।"
https://www.altnews.in/golam-azam-was-not-in-the-emergency-building-at-the-time-of-r-g-kar-crime-multiple-testimonies-support-his-alibi/
("সব মিলিয়ে, এগুলো প্রমাণ করে যে গোলাম আজম আর.জি.কর হাসপাতালের ওই রাতে ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারেন না। সামাজিক মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে যে বিচারের দাবি উঠেছে, তাতে কোনো প্রমাণ নেই।")

৪. মিথ্যা: "ডাক্তার আর্শিয়ান আলম ঘটনার সাথে জড়িত।"
https://www.altnews.in/arshean-alam-social-media-trial-alt-news-probe-finds-he-was-at-home-at-the-time-of-the-r-g-kar-rape-murder/
("এসব প্রমাণ করে যে, কলকাতার আর.জি.কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও

হত্যাকাণ্ডের সাথে আর্শিয়ান আলমের সরাসরি জড়িত থাকার যে দাবি সামাজিক মাধ্যমে করা হয়েছে, তা মিথ্যা। এবং তিনি পলাতক নন।”)

৫. মিথ্যা: সেমিনার হল ভেঙে ফেলা হয়েছিল।
https://www.altnews.in/seminar-room-at-r-g-kar-hospital-the-crime-scene-was-not-impacted-by-the-midnight-violence-after-kolkata-rape-murder/
(“সংক্ষেপে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া যে দাবি করা হয়েছে যে কলকাতার আর.জি.কর হাসপাতালের বুকে বিভাগের সেমিনার হলটি, যেখানে নিহত চিকিৎসকের দেহ পাওয়া গিয়েছিল, তা ধ্বংস বা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, সেই দাবি মিথ্যা।”)

৬. মিথ্যা: প্রিন্সিপ্যাল সন্দীপ ঘোষের পাশেই সঞ্জয় রায়কে কেক কাটতে দেখা গেছে।
https://www.altnews.in/sanjay-roy-cutting-cake-next-to-ex-principal-sandip-ghosh-no-man-in-viral-photo-is-not-the-r-g-kar-accused/
(“এটি প্রমাণ করে যে ভাইরাল ছবিতে সন্দীপ ঘোষের পাশে কেক কাটতে দেখা যাওয়া ব্যক্তি কলকাতার আর.জি.কর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার অভিযুক্ত নন, তিনি প্রসূন চ্যাটার্জি। ছবিটি জানুয়ারি ২০২০-এর।”)

৭. মিথ্যা: সুপ্রিম কোর্ট ঘটনাস্থল অর্থাৎ ক্রাইম-সিন পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন।
https://www.altnews.in/supreme-court-did-not-say-r-g-kar-crime-scene-was-altered-false-claim-by-editor-of-propaganda-outlet/
(“অতএব, OpIndia-এর সম্পাদক নুপুর জে শর্মা এবং অন্যদের দ্বারা করা দাবি মিথ্যা। সুপ্রিম কোর্ট ক্রাইম সিন পরিবর্তনের কথা বলেনি। এটি সিবিআইয়ের পরামর্শদাতা তুষার মেহতার, ভারতের সলিসিটর জেনারেলের দাবি ছিল।”)

এই খবরগুলির জন্য যে পরিশ্রম ও তদন্ত করতে হয়েছে সেই সময়ে, তার সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্যই অল্ট-নিউজের কর্মীদের প্রাপ্য।

মানুষের বই পড়ার অভ্যাস নাকি হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ বইয়ের দাম বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বোঝা যায়, ক্ষুদ্র একটা পাঠকবৃত্তকে সম্বল করে চলছে বই-ব্যাবসা। ছোট্টো পাঠকবৃত্ত, তাই বইয়ের দাম বেশি, আবার বইয়ের দাম বেশি বলে পাঠকসংখ্যা কম, তৈরি হচ্ছে এরকম এক অন্তহীন দুষ্টচক্র।
এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আমাদের দাওয়াই 'দত্তক'। গুরুচণ্ডা৯ লেখক-পাঠক সমবায়ে বিশ্বাসী, মুনাফায় নয়। গুরুচণ্ডা৯র শুভানুধ্যায়ীরা নিয়মিতভাবেই এক বা একাধিক বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক দায়ভার বহন করেন, যার পোশাকি নাম 'দত্তক'। বাজারচলতি বইয়ের চেয়ে কমে আসে আমাদের বইয়ের দাম। পৌঁছে যায় আরও বহু মানুষের কাছে।
আপনি কি এই মিথোজীবিতার সক্রিয় অংশীদার হতে চান? গুরুচণ্ডা৯-র বই দত্তক নিতে চান?
যোগাযোগ করুন: guruchandali@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ: +৯১ ৯৩৩০৩ ০৮০৪৩

গুরুচণ্ডা৯

পাল্টা

একটি উল্টো প্রতিষ্ঠান